অষ্টম অধ্যায়

উনিশ শতকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় স্বদেশ ভাবনা

উনিশ শতকের একাধিক সাহিত্য প্রকরণের মধ্যে স্বদেশভাবনার আলোচনায় প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ জাতীয় রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ জাতীয় সাহিত্য রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনাগুলি আলোচিত হওয়ায় এখানে মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রবন্ধ আলোচিত হচ্ছে।

সচেতন বাঙালী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আপামর বাঙালীকে দুর্বলতা, ভীরুতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, সামাজিক ব্যভিচার প্রভৃতি বর্জন করার সুপরামর্শ, অ।র্থ-রাজনৈতিক অচেতনতা দূর করার প্রয়োজনীয় উপদেশ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই নীতি-উপদেশ বা পরামর্শ সরাসরি প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ জাতীয় রচনাকে প্রভাবিত করেছে। নক্‌শা সাহিত্যের মতো শুধুই তীক্ষ্ণসমালোচনা বা ব্যঙ্গ নয়, কিংবা সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের মত ইঙ্গিতে বা পরোক্ষে প্রেরণা নয়, সরাসরি যুক্তি ও মননের দ্বারা প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জন করে জাতিকে সংগঠিত তথা সমৃদ্ধ করার আন্তরিক প্রয়াস এই সময়ের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাবন্ধিক হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন — রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-১২৯৪ বঙ্গাব্দ), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২), যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩--১৯০২), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪—১৯১৯), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৭—১৯৩৭), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪১—১৯১০), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৮—১৯১৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ। উল্লিখিত প্রাবন্ধিকগণ জাতির উত্তরণের জন্য কখনো প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন করেছেন দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল স্বরূপ, কখনো আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলার জন্য গৌরবময় দেশীয় ইতিকথা ও পুরাতত্ত্ব, কখনো জাতীয় জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি আনবার জন্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা, কখনো মানব মনকে সমৃদ্ধ করতে দর্শনের মতো সূক্ষ্ম চেতনার অবতারণা, কখনো বা জাতীয় জীবনের

মানোন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার প্রচার করেছেন। আবার কখনো বা সমগ্র দেশকে জননী রূপে কল্পনা করে জননীর নগ্নতা, কলঙ্ক দূর করার মত অনুপ্রেরণা উনিশ শতকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনাগুলি ছন্দহারা একটি জাতিকে মানুষের মতো করে বাঁচার পরামর্শ দিয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে উনিশ শতকের বিখ্যাত কয়েকজন প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনা ধারাবাহিক আলোচনা করব।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। বাঙালীকে সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। সেজন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাজাত্যবোধ, সম্প্রীতিবোধের মতো একাধিক মহৎ গুণাবলী অর্জনের জন্য রঙ্গলালের লেখনী ছিল মুখর।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর পদচারণা চোখে পড়ার মতো। রঙ্গলালের প্রবন্ধ ও সমজাতীয় রচনায় সরাসরি স্বাজাত্যবোধ, সম্প্রীতিবোধ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি গঠনমূলক বা ইতিবাচক বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। সেদিনের বাঙালী পাঠককে যা সচেতন ও সংগঠিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

প্রথমে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাদেশিক সম্প্রীতি বিষয়ক রচনার বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। রঙ্গলাল কর্মসূত্রে অনেক দিন উড়িষ্যায় বসবাস করেছিলেন। উড়িষ্যায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে, সেখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ হন। তিনি জানতেন, জাত্যাভিমানী কিছু ইংরেজ যেমন ভারতীয়দের ঘৃণা করত, সেরকম কিছু জাত্যাভিমানী বাঙালী উড়িয়াদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। কিন্তু এরকম জাত্যাভিমান ভারতীয়দের একতার পরিপন্থী। সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনের জন্য তুচ্ছ প্রাদেশিকতাকে বিসর্জন দেবার মতো উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে রঙ্গলালের 'উৎকলবর্ণন', 'কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্তবাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা', 'দীনকৃষ্ণদাস' ও 'উপেন্দ্র ভঞ্জ' নামক প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনা। এইসব রচনায় রঙ্গলাল অনেক বাঙালীর ভ্রান্ত ধারণার অবসানের জন্য উড়িয়াদের সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে অলোকপাত করেছেন।

উৎকল বর্ণন (১৮৬৩) ঃ

'উৎকল বর্ণন' তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে উৎকল দেশের প্রাচীনত্ব নির্ণীত হয়েছে। উড়িয়ারা কোন আগন্তুক বা বর্বর জাতি নয়। প্রাবন্ধিকের ভাষায়;—

"প্রকৃত আর্য জাতির যে সকল শাখা ভারতবর্ষ মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে, উৎকল দেশীয়েরা তাহারই এক শাখা।...শূরসেন প্রদেশীয়, সারস্বত প্রদেশীয়, কান্যকুব্জ প্রদেশীয়, মগধ প্রদেশীয় এবং বঙ্গ তথা উৎকল প্রদেশীয় হিন্দুদিগের মধ্যে আচার ব্যবহার ভাষা-শরীর এবং প্রকৃতির যে কিছু উৎকর্ষাপকর্ষ থাকুক, তাহারা সকলেই এক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ফল পুষ্পাদি স্বরূপমাত্র।"(১)

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উড়িষ্যার ভূপ্রকৃতি, নদনদী, উৎপাদিত দ্রব্য লবণ, কৃষি, ফলমূল প্রভৃতির পরিচয় আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের পরিচয়মূলক আখ্যান। এখানকার খনিজ সম্পদ, কৃষি, বন্যসম্পদ, জীবজন্তু, বন্যঔষধ, ফল, ফুল, পাখী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাবন্ধিক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'উৎকল বর্ণন'-এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে অথচ নানামুখী বর্ণনার দ্বারা উড়িষ্যা সম্পর্কে বাঙালী পাঠককে জাত্যাভিমান পরিহার করার আবেদন জানান। রঙ্গলাল সরাসরি পাঠককে উদ্দেশ্য করে বলেন;— "এইক্ষণে প্রার্থনা করি, পাঠক মহাশয়েরা উড়িয়াদেশের কথা বলিয়া এই প্রস্তাবকে অবহেলা না করেন, শৈলগহ্বরে মাণিক্য থাকে এমত নহে, বল্মীক-স্তূপেও তাহা কখনও কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে।"(২)

কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা (১৮৬৬) ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা"-র অধিকাংশ স্থানে বাংলা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেন। রঙ্গলাল বাঙালী পাঠক ও উড়িয়া শ্রোতাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন;—

"উৎকল ভাষা এবং বঙ্গভাষার মধ্যে তাদৃশ বিভিন্নতা নাই, একথা সকলেই অবগত আছেন। সকল ভাষারই ভিত্তি এবং পত্তন স্বরূপ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়া, — এই চতুর্বিধ ভাষামূল উৎকল এবং বঙ্গভাষায় প্রায় একই প্রকার, কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিগত প্রত্যয় সকল একপ্রকার না হইবাতে প্রভেদ বোধ হইয়া থাকে।"(৩)

কিংবা "বস্তুতঃ কলিকাতার বাঙ্গলা এবং চট্টগ্রামের বাঙ্গলার মধ্যে যত প্রভেদ দেখা যায়, তাহা বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা এবং উৎকলীয় সাধুভাষার মধ্যে দ্রষ্টব্য নহে।"(৪) এছাড়া এই বক্তৃতায় উড়িয়াদের শিক্ষা ও উড়িয়া ভাষা সমৃদ্ধির জন্য সৎপরামর্শ আছে। পরিশেষে বক্তব্যটির মূল ব্যঞ্জনা অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়,— উড়িয়াবাসীর জাতিগত প্রাচীন কৌলীন্যের মতো উড়িয়া ভাষার পুরোনো কৌলীন্য ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা। যাকে অবজ্ঞা বা উপহাস করা কোন মতেই উচিত নয়।

'দীনকৃষ্ণদাস' ও 'উপেন্দ্রভঞ্জ' ঃ

দীনকৃষ্ণদাস ও উপেন্দ্রভঞ্জ উড়িয়া ভাষার বিখ্যাত কবি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য চর্চার দৃষ্টান্ত হিসাবে এই কবিদ্বয়ের জীবনী ও কাব্য সমালোচনা করেন। কবিদ্বয়ের জীবনী প্রকাশ ও কাব্য সমালোচনার দ্বারা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন, উড়িষ্যাবাসীও বাঙালীর মতো সাহিত্য ও সংস্কৃতি বোধে সমৃদ্ধ জাতি।

এবার রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এবিষয়ে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন'।'শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন' প্রবন্ধটি হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতির বিচারকমণ্ডলী — রামগোপাল ঘোষ, আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — কর্তৃক নির্বাচিত নৈতিক ও মানসিক বিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের সমকালীন অশিক্ষা, দরিদ্রতার মত নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জগৎসভায় জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। তিনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলেন—"জগতীতলে প্রধান জাতি পদবী আরোহণের আশা কিছু স্বপ্নবৎ অসার নহে, অন্বেষণ করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইবে ইতি।"[৫] তিনি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ জাতির শিরোপা অর্জনের অন্যতম অন্তরায় দৈহিক দুর্বলতা ও রুগ্নতা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জাতির এরকম কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় 'শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন' নামক প্রবন্ধ লিখে সৎপরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধটি চারটি অংশে বিভক্ত । যথা;—

১। 'দৈহিক বলপ্রাচুর্য্যের প্রয়োজন।'

২। 'প্রাচীন সাময়িক হিন্দুদিগের ব্যায়াম চর্চ্চা।'

৩। 'প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের ব্যায়াম চর্চ্চার বিবরণ।'

৪। 'ব্যায়াম চর্চ্চার সদুপায় ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হেতু অশেষ দোষোদ্ভাব — তথা রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাহা প্রচলিত করণের আবশ্যকতা।'

১। দৈহিক বল প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন, জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মানসিক শক্তি ও শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। তাঁর মতে;— "..... দৈহিক এবং মানসিক বলের সামঞ্জস্যই মনুষ্যজাতির সুখ বৃদ্ধির নিদান হইয়াছে,—একের অভাব এবং অন্যের প্রাদুর্ভাব হইলে বিপরীত ফলোৎপত্তির

সম্ভাবনা।"[৬] প্রাবন্ধিক দৈহিক বলের বিষয়ে বলেন;—"অতএব বাঙ্গালী জাতির হিতৈষিগণ বিবেচনা করুন,—যেখানে বাঙ্গালিরা উক্ত সমুদায় পুরুষার্থের প্রতিপাদক বাহুবল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিকৃষ্টকল্প, সেখানে তাঁহাদিগের পুনরুদ্ধার কল্পে শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার কতদূর পর্য্যন্ত আবশ্যকতা আছে।"[৭]

২। প্রাচীন সাময়িক হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তির শ্রদ্ধা এবং পরিপূর্ণ আস্থা আছে। শরীর চর্চার দ্বারা প্রাচীন ভারতবাসী বাহুবল অর্জন করতেন —এরকম প্রমাণ পেলে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতা বাহুবল লাভে মনোবল পাবে। তাই প্রাবন্ধিক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রোতা ও পাঠক) দেশবাসীকে শরীরচর্চার দ্বারা বলিষ্ঠতা অর্জনের জন্য সচেতন করে দিয়ে বলেন;—

> "তোমরা আর কতদিন ঐশিক এবং মানুষিক বিধির বিপর্য্যয়ে দৈহিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যে কালহরণ করিবে? তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলা কি কিছুই তোমাদিগের তিমিরাবৃত অন্তঃকরণে পতিত হয় না।?"[৮]

৩। প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের ব্যায়াম চর্চ্চার বিবরণ ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের বিষয়কে মনোগ্রাহী করার জন্য সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ইউরোপীয় জাতির পূর্বপুরুষদের ব্যায়াম চর্চার দৃষ্টান্ত দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রীক প্রমুখ জাতির কথা বলেন। তিনি দাবী করেন ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মানীর মত আমাদের দেশেও বিদ্যালয়-শিক্ষায় শরীর শিক্ষাকে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। তাঁর মতে;—

> "আমাদিগের দেশে সেই সকল উপায় অবলম্বিত না হইলে বিদ্যাধ্যাপন প্রণালী কোনরূপেই সংশুদ্ধ বা সম্পূর্ণপদে বাচ্য হইতে পারিবেক না, — বস্তুতঃ তদ্রূপ শিক্ষা বিরহে এতদ্দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন হইবেক না, — বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা এতদ্দেশীয় বালকদিগের মনে কেবল কল্পনা এবং বিভাবনা পরিপূর্ণ হওনেরই সম্ভাবনা, তাহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যতে স্বদেশের উৎকর্ষ সম্পাদিতহইবার প্রত্যাশা নাই,"[৯]

৪। ব্যায়াম চর্চ্চার সদুপায় ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হেতু অশেষ দোষোদ্ভাব —তথা রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাহা প্রচলিত করণের আবশ্যকতা ঃ

সাবলীল জীবন যাপন করার জন্য সুস্থ শরীর প্রয়োজন। সুস্থ শরীর লাভ তখনই সম্ভব, যখন বাবা-মা তাঁদের সন্তানের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের প্রতি যথাযথ নজর দেবেন। এদেশে রুগ্ন ও দুর্বল শিশু জন্মানোর

পিছনে পরোক্ষে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নারীর পরাধীনতা, অশিক্ষা, দরিদ্রতা প্রভৃতি কারণ রয়েছে। তাই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—".....যাহাতে সুশিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হয়, তৎপক্ষে যত্ন করা দেশহিতৈষি মনুষ্য মাত্রের অতিকর্ত্তব্য হইয়াছে"(১০) তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন;—

> "সুতরাং রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ব্যায়াম শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হইলে কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে, আমাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষিতেরা ব্যায়াম চর্চার অমৃতময় ফলানুভব করিয়া তাঁহাদিগের সন্তানগণকে অতি শৈশব কালাবধি সুশিক্ষার সাহায্যে সুন্দর সবল ও সুস্থ শরীর করিতে পারেন।" (১১)

প্রবন্ধের শেষে পাঠকের প্রতি আবেদন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছে, যা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশানুরাগের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তিনি বলেন;—"তোমরা যখন বীরবপু অন্যদেশীয় লোকদিগের সমাজে স্বজাতীয় লোকের শারীরিক লাবণ্য এবং ক্ষুদ্রতা দর্শন করহ, তখন কি তোমাদিগের মনে লজ্জার উদয় হয় না ?"(১২)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়েও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা 'বঙ্গবিদ্যার আদ্য বিবরণ' ও 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামক রচনা দু'টির আলোচনা করে রঙ্গলালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগের পরিচয় গ্রহণ করব।

উনিশ শতকে জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যাঁরা প্রয়াসী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'বঙ্গবিদ্যার আদ্য বিবরণ' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিক তাঁর অনুসন্ধানমূলক মানসিকতাকে সাধারণ লেখকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির আহ্বান জানান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি বলেন;—

> "বাঙ্গালা ভাষায় লিপি চর্চ্চায় অনুরাগলাভের আকাঙ্ক্ষিগণ যদি অপরাপর সামান্য সামান্য বিষয়ে লেখনী চালনা না করিয়া স্বদেশের যাবতীয় বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া গ্রন্থ লেখেন, তাহা হইলে বিহিত উপকার হইতে পারে। প্রত্যুত, বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদিগের জীবনচরিত যে দুষ্প্রাপ্য তাহা আমরা এইক্ষণেও বিশ্বাস করি না — ফলতঃ দুরনুসন্ধেয় সন্দেহ নাই। লেখকেরা অনুসন্ধান করুন— সমস্ত সন্ধান পাইবেন।" (১৩)

প্রবন্ধটিতে বাঙালী ও বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের বিষয়ে কিছু মতামত আছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরবের সঙ্গে বলেন;—"সুন্দরবন যে সময়ে বসতিপূর্ণ ছিল, সে সময়ে ইংলণ্ডেও সম্পূর্ণ সভ্যতার উদয় হয় নাই।"(১৪) কিংবা "বাঙ্গালাদেশ যে নিতান্ত আধুনিক নহে, ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন

গ্রন্থে পাওয়া যায়।"[১৫] তাঁর মতে একদিকে বিদেশী শাসন ও অন্য দিকে দেশীয় পণ্ডিতদের বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা— বাংলা ভাষার উৎকর্ষতা সৃষ্টির পক্ষে প্রতিকূল ভূমিকা নিয়েছিল।

প্রবন্ধটিতে রামমোহনের পূর্বের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কবি, লেখক, গ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে আকর্ষণীয় নানা তথ্য পাওয়া যায়। প্রবন্ধে কবিকঙ্কন মুকুন্দ, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবকাল বিষয়ের যথাসম্ভব মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া প্রথম বাংলা ব্যাকরণ (হালহেডের ব্যাকরণ) রচয়িতা, বাংলায় মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন (স্যার চার্লস উলকিন্স বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের পরিকল্পনা কর্তা এবং এটি তৈরী করেন পঞ্চানন নামে এক কাঠ মিস্ত্রি), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গদ্য চর্চার ইতিহাস (উইলিয়াম কেরী প্রমুখের অবদান), স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ ও বিখ্যাত গ্রন্থকার প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেক সামগ্রী অনুসন্ধানের অভাবে বাঙালীর নাগালের বাইরে ছিল। বলা যায়, প্রাবন্ধিক অনুসন্ধানের আদর্শ তৈরী করতে 'বঙ্গ বিদ্যার আদ্য বিবরণ' রচনা করেন। তাতে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভীর অনুরাগই ধরা পড়েছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-এ নিখুঁত যুক্তির সাহায্যে মনের ক্ষোভ, প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশ ও স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

দেশকালভেদে কবিতা-প্রকৃতির ব্যবধান ঘটে। বাংলা ও ইংরেজী কবিতার মধ্যে পার্থক্য দেশভেদের জন্য। অবশ্য সমসাময়িককালে সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যে উৎকর্ষতাপূর্ণ কবিতার বাহুল্য ছিল না। সেজন্য মাতৃভাষার কবিতা কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল—এসব অভিযোগ ঠিক নয়। প্রাবন্ধিক 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-এ মাতৃভাষা অপমানের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যারা বাংলা কাব্যকে ইংরেজী কাব্যের তুলনায় নিতান্ত হেয় জ্ঞান করেন, তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন ইংরেজী সাহিত্যেও অসংখ্য অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিষয় আছে। তিনি মাতৃভাষা সাহিত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ প্রকাশ করে বলেন;— "আমারদিগের দেশীয়া কবিতাকে আমরা অবশ্যই প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আদর করিব।"[১৬]

'বেথুন সোসাইটি'তে পূর্ব বক্তা হরচন্দ্র দত্তের প্রতিবাদ করে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী কবি ও কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন এবং বাংলা কাব্যের উজ্জ্বল অদূর-ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বলেন। এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক রঙ্গলাল বলেন;—"এই প্রবন্ধ বীটন সভায় পঠিত হয়; সুতরাং বক্তৃতার নিয়মে লিখিত হইয়াছে। অপিচ বাঙ্গালা কবিতার প্রতি উক্ত সভার কতিপয় সভ্য অকারণ কটূক্তি করাতে তদুত্তরেই এতৎ প্রবন্ধের

অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে,"[১৭] এই প্রবন্ধে বাংলা কাব্যের উন্নতিকল্পে তাঁর উৎসাহমূলক আহ্বান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বেথুন সোসাইটিতে তিনি বলেন;—"হে সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কাল বিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা-হার যাহাতে সভ্যকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্ব্বরা আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন,"[১৮] এই বক্তব্যে রঙ্গলালের স্বদেশীয় সাহিত্য প্রীতির বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস বিষয়ক রচনা 'কলিকাতা কল্পলতা' (ভারতী পত্রিকা, কার্তিক ১৩৬৬)। 'কলিকাতা কল্পলতা' কলকাতার ইতিহাস রচনা ও ইতিহাস সংরক্ষণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"...এই সময়ে আসিয়াখণ্ডের সর্ব্বপ্রধান নগরী এই কলিকাতার শত শত বৎসরের পূরাবৃত্ত সংগ্রহ করা অতি প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। যেহেতু এই শুশ্রূষনীয় বিষয় এক্ষণে সংগৃহীত না হইলে কিছুকাল পরে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাও ব্যর্থ হইবে। এখনও অনেক স্থানীয় লোক জীবিত আছেন এবং দুই-একখানি প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে এতদুভয় দুর্লভ হইয়া উঠিবে। এইসব বিবেচনা করিয়া "কলিকাতা কল্পলতা" নামে এই অভিনব গ্রন্থের রচনাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গেল।"[১৯] স্বদেশীয় নগরী কলকাতার ইতিহাস সংরক্ষণের বিষয়ে গ্রন্থকারের গভীর অনুরাগের বিষয়টি উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে।

শুধু ইতিহাসের প্রতি অনুরাগই নয়, 'কলিকাতা কল্পলতা'য় ধরা পড়েছে লেখকের ইতিহাস অনুসন্ধানে যত্নশীল হওয়ার বিশেষ মনোভাব। যথা—কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজের প্রভুত্ব বিস্তার ও নগরীর ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতার তথ্য, কলকাতা যে অর্বাচীন নয়— ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কবিকঙ্কণের কাব্যে কলকাতার উল্লেখের বিশেষ তথ্য, অন্ধকূপ হত্যার প্রচলিত মতের বিরোধিতা (অন্ধকূপ হত্যায় তিনি নবাবকে দায়ী করেন নি), মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর জন্য হেস্টিংসের ষড়যন্ত্র, মধ্যযুগীয় রাজত্বের তুলনায় ইংরেজ রাজত্বে সুখ, শান্তি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জোয়ার এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে শেঠ পরিবার, ঘোষাল পরিবার, বাগবাজারের মিত্র পরিবার, শোভাবাজার রাজপরিবার, মল্লিক পরিবার, ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি বিখ্যাত দেশীয় পরিবারের ইতিহাস রয়েছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশীয় নগরীর ইতিহাস সংগ্রহের যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, প্রথম দিকের রচিত সে ইতিহাস কিন্তু যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।

আমরা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় স্বাজাত্যবোধ, সম্প্রীতিবোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় পাই। বলা যেতে পারে, এই সব বিষয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম স্বদেশ ভাবনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) স্বদেশীয় মানুষের অধঃপতন দশা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। তিনি ব্যক্তি জীবনে যে দর্শন মেনে চলতেন, যা বিশ্বাস করতেন, যাকে শ্রদ্ধা করতেন—প্রবন্ধে তাকেই তিনি লেখনীর বিষয় করেছেন। এককথায় তাঁর লেখনী বা সাহিত্য চর্চা মানুষের জন্য। তিনি কখনো 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব', (১৮৫৬), 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' ১ম ও ২য় (১৮৫৮-৫৯), 'পুরাবৃত্ত সার' (১৮৫৮), ' ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২), 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৩), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৯০৪)- এর মত উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য লেখনী ধারণ করতেন; কখনো বা 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' রচনার দ্বারা দেশীয় মানুষের সদাচারে জীবন-যাপনের জন্য উপদেশমূলক ও নীতিমূলক গ্রন্থের উদ্দেশ্যে লেখনী চালনা করতেন। তিনি প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ববোধকে সচেতন করার প্রতি জোর দেন। স্বদেশীয় শাস্ত্র, দর্শন, আচার প্রভৃতির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি, আধুনিক জীবনেও এগুলির যথার্থ প্রয়োগ প্রয়োজন,— ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধগুলির দ্বারা সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই বলে রক্ষণশীলের মতো পাশ্চাত্যের নবভাবধারাকে বর্জন করা নয়, বরং প্রয়োজনীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যুগলবন্দী করে জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবনী শক্তি দান করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি মধুসূদন প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলদের মতো উচ্ছৃঙ্খলতার পথে না গিয়ে স্বদেশীয় মত ও পথের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি দেশকে জননীরূপে কল্পনা করে নানাবিধ দেশহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

এখানে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করা হবে। তাঁর রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি হল;— 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) ও 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯২)।

পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২) ঃ

উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঢেউ ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করলে ভারতের চিরকালীন কিছু নিয়ম, নীতি, আচার ব্যবহারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। মানুষ অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে থাকে, জীবনে অবকাশের সময় কমে যায়। প্রচলিত চিরকালীন নীতি-ধর্মকে মানুষ এড়িয়ে চলতে চায়। এরকম একটি

যুগসন্ধিক্ষণে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' পাশ্চাত্য ছোঁয়াচে রোগ থেকে দূরে রাখার পথ-নির্দেশিকা। বলা চলে একটি আদর্শ ভারতীয় পরিবার পরিকল্পনার অন্যতম মননশীল ব্যাখ্যা— 'পারিবারিক প্রবন্ধ'।

'পারিবারিক প্রবন্ধ' একটি পরিবারের কর্তা থেকে প্রতিটি সদস্যের আপন আপন কর্তব্যবোধ বিষয়ে উৎকৃষ্ট নীতি ও উপদেশ কথায় পরিপূর্ণ। লজ্জাশীলতা, কুটুম্বতা, জ্ঞাতিত্ব, অতিথি সেবা, চাকর প্রতিপালন, ভাই-ভগিনী সম্পর্ক, কন্যা-পুত্রের বিবাহ, সন্তানের শিক্ষা, গৃহকার্যের ব্যবস্থা, রোগীর সেবা প্রভৃতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে প্রাবন্ধিক এই গ্রন্থের দ্বারা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন।

'লজ্জাশীলতা' নামক অংশে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন;— "পাশব ধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের যে ঘৃণা, তাহাই লজ্জার মূল কারণ। যে মনুষ্য সমাজ যত দিব্যভাবাসম্পন্ন এবং সুশীল ও সভ্য হইবার জন্য যত্নশীল, সেই সমাজের মধ্যে লজ্জার তত আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।"[২০] তিনি ইউরোপের সমাজের সঙ্গে ভারতের সমাজের তুলনা করে বলেন;—"আমাদের শাস্ত্রকারেরা এইরূপ পশুধর্ম্মের অন্তর্গূঢ় ব্রহ্মভাবের আবিষ্কৃতি করিয়া পাশব কার্য্যগুলির পাশবত্ব মোচন করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে এরূপ হয় নাই।"[২১] প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বদেশীয় সমাজে লজ্জার অস্তিত্বকে গৌরবের সঙ্গে প্রকাশ করেন।

সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) ঃ

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটি যে উদ্দেশ্যমূলক তা প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'গ্রন্থের আভাস' নামক অংশে ব্যাখ্যা করেন। তিনি স্পষ্টতই বলেন — এই গ্রন্থটি কোন রাজনৈতিক আন্দোলনকে সহযোগিতা করার জন্য নয়, স্বজাতীয় ইংরেজী শিক্ষিত বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি শ্রেণীর শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত। 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এ স্বদেশীয় ধর্ম, সমাজ, পরিবার, আচার, ব্যবহার, প্রভৃতির স্পষ্ট স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং সামাজিক মানুষের কর্তব্যবোধের ইঙ্গিত রয়েছে।

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সমাজে জাতীয় ভাব অর্জনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত জাতীয় ভাব অর্জন করা যে অবাস্তব বিষয় নয়, সে বিষয়ে যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজে ইউরোপীয়দের আগমন হওয়াতে যে সুফল ও কুফল হয়েছে তার সমালোচনা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা করায় ভারতীয় সমাজের কুফলের দিকটি সমালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইংরেজ আগমনে ভবিষ্যতে কিরূপ ফলের সম্ভাবনা আছে, তার অনুমান করা হয়েছে। পরিশেষে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজের সত্ত্বা ও জাতীয় প্রকৃতি রক্ষা করার জন্য কি কি কর্তব্য তার যুক্তিধর্মী মননশীল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, প্রাবন্ধিক স্বদেশীয় সমাজের নিজস্ব রূপটির প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে সমকালীন সমাজে স্থায়ী করার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। সেজন্যই তিনি এরকম উদ্দেশ্যমূলক একটি সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। স্বদেশীয় ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির সপক্ষে মত লক্ষ করার মতো। আলোচ্য বিষয়গুলি আধুনিক যুগেও সমান তাৎপর্যপূর্ণ, প্রাবন্ধিক ঘুরেফিরে যুক্তি দিয়ে সে কথাই বোঝানোর চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে—আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষা প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্র ও শিক্ষার কাছে এখনো অসম্পূর্ণ। তাঁর ভাষায়;— "বিজ্ঞানের অতদূর উন্নতি হইতে অনেক বিলম্ব আছে।"(২২)

অতএব ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে কিছু করণীয় আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই কর্তব্য কর্মগুলি ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছেন। তিনি অনুমান করেন, যুগাবতার আবির্ভূত হয়ে সমকালের অনাচার দূর করবেন। কেননা ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা কেবল অনুকরণ করেই ক্ষান্ত। ইংরেজের মহৎ গুণ গ্রহণ করতে তাঁরা অক্ষম। তাছাড়া স্বদেশীয়দের মধ্যে নিন্দাবাদ, ঘৃণা, কুৎসা রচনার মতো মানসিকতার বিলোপ না হলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিক মনে করেন—ভারতীয়দের কলহপরায়ণতা, বিদ্যাহীনতা প্রভৃতির কারণ ধর্মজ্ঞানহীনতা। অতএব দেশীয় সমাজকে, দেশীয় ধর্মের মূল বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, পরিবারে শান্তি স্থাপনের জন্য, সমাজকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করার জন্য ভারতীয় আচার সংস্কৃতির অনুসরণ আবশ্যক। পরিশেষে তিনি বলেন—মুক্তির উপায় একমাত্র ধর্মকে অবলম্বন করা। কেননা ধর্মভাবের উদয় হলে মানুষ আত্মসংযমী হয়। এবং জাতি ধন, বল ও বিদ্যা প্রভৃতি সম্পদে শ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিচিতি পায়। তাই ভূদেব মুখোপাধ্যায় মনে করেন ভারতীয় সমাজের উন্নয়নের জন্য ভারতীয় ধর্মকে অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯২) ঃ

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সদাচারকে ধর্ম বলেছেন। এ ধর্ম সম্পূর্ণ দেশীয় ধর্ম। তিনি বলেন— ইংরেজ জাতি পৃথিবীতে সবদিক দিয়ে উন্নত, এই ইংরেজের চেয়েও আমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারি। তা হতে পারে একমাত্র সদাচারের ফলে। তাঁর ভাষায়;—"সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন।"(২৩) কিন্তু এই আচারধর্ম পালন করার ক্ষেত্রে কতগুলি প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন;—শাস্ত্রীয় বিধি বা আচার সম্বন্ধে মানুষের অবজ্ঞা, শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, বিজাতীয়দের অনুকরণের প্রবল ইচ্ছা। এইসব প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

তাছাড়া মানব জীবনে সাফল্যের শীর্ষচূড়া স্পর্শ করতে হলে স্বেচ্ছাচারিতা বা পশুধর্ম এবং আলস্যভাব

বা জড়ধর্ম ত্যাগ করা উচিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন;—"পশুভাবের নূন্যতাসাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য"[২৪] কিংবা "মনুষ্যে যে 'জড়ধর্ম্ম' আছে তাহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ তাঁহার আলস্য। শাস্ত্রাচার আলস্য নাশ করে।"[২৫] সেজন্য প্রাবন্ধিক বলেন; —শাস্ত্রাচার অবলম্বন করার অর্থ প্রকৃত ধর্মাবলম্বন করা। তাঁর ভাষায়;—"ধর্ম্মই শাস্ত্রাচারের মূল।"[২৬] তিনি যুক্তিসহকারে বলেন শাস্ত্রাচার অবলম্বন করলে আয়ু দৃঢ় ও বৃদ্ধি হয়, ধনলাভের পথ সুগম হয়, যশ লাভ হয়, সর্বোপরি পুণ্যবান হওয়া যায়।

অতএব, শাস্ত্রাচার অবলম্বন করার প্রেরণা দিয়ে দেশীয় সমাজকে পতন দশা থেকে মুক্ত করার বাসনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় 'আচার' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ', সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধ'-এর আলোচনা শেষে বলা যায়— স্বদেশীয় পরিবার, সমাজ ও আচার-সংস্কৃতির বিপন্নতার দিনে প্রবন্ধগুলি সঞ্জীবনী শক্তির মতো কাজ করার যোগ্যতা রাখে; যা লেখক তথা প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ ভাবনার পরিচয় বহন করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? —এই বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল। 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন;—"এ জীবন লইয়া কি করিব"।[২৭] বঙ্কিমচন্দ্রের এই জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর সাহিত্যে এর পরিচয় আছে। বঙ্কিম রচনাসমগ্র অধ্যয়ন করলে মনে হবে—দেশাচারে বিশ্বাসী, ধর্মজ্ঞানহীন, আস্থাহীন, অনুকরণপ্রিয়, দেশাত্মবোধহীন, জাতীয় গৌরববোধহীন বাঙালীকে সচেতন ও সমৃদ্ধ করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন, লোকহিতই ধর্ম এবং দেশপ্রেম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আর এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম নিহিত রয়েছে দেশের মানুষের উন্নতি করার সক্রিয়তার মধ্যে। অর্থাৎ স্বজাতির উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায়—নীতি ও উপদেশ, প্রত্যক্ষ দেশভাবনা, অতীত তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা জাতীয় গৌরব প্রচার ও বাস্তব জীবনকে সমৃদ্ধ করার প্রেরণার মত বিষয়গুলি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে।

বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। যথা;—'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'সাম্য', 'কৃষ্ণচরিত্র', ধর্ম্মতত্ত্ব', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম'। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনার আলোচনা করে স্বদেশ ভাবনার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা হবে।

লোকরহস্য (১৮৭৪) ঃ

'লোকরহস্য' পাঠ করলে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের রঙ্গ-রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রঙ্গব্যঙ্গ বাণের লক্ষ্য — সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বিজ্ঞাপনে বলেছেন;—"সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ...এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।"[২৮] আসলে সামাজিক যে দোষ ত্রুটিগুলি রয়েছে তাকে ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের মানুষগুলিকে নীতিবোধ ও সুস্থ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। লেখকের এই আন্তরিক আবেদন গ্রন্থটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে। গ্রন্থটির কয়েকটি রচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা হচ্ছে।

১। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল ঃ

এই রচনাটিতে উনিশ শতকে বাঙালীর বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা, সভা-সমিতির সভ্যদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, বাবু সাজার প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যঙ্গ ও রসিকতা আছে। ব্যাঘ্রাচার্য্য মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন;—

> "সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! মনুষ্য একপ্রকার দ্বিপদ জন্তু। ...মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। ... ইহা ভিন্ন হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।"[২৯]

এই বক্তব্যে বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালীন অন্তঃসারশূন্য বাবু সমাজের সভা-সমিতির কথা যা মনে করিয়ে দেয়।

২। ইংরাজ স্তোত্র ঃ

ধন-মান-যশ প্রত্যাশী ইংরেজগুণে মুগ্ধ ইংরেজ-স্তাবক সম্প্রদায়কে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করেছেন। 'ইংরাজ স্তোত্র'-এ ২৮টি ইংরাজ-স্তুতি রয়েছে। এর একটি যেমন;— "হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন—আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।"[৩০]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এজাতীয় স্তুতি আত্মপ্রত্যয়শীল জাতিকে আহত করে।

৩। রামায়ণ সমালোচনা ঃ

ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্তাবকের মুখে রামায়ণের ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা 'রামায়ণ সমালোচনা'। কোন গূঢ় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে যে অধ্যবসায় ও সাধনার প্রয়োজন তার অধিকারী না হয়ে কোন সমালোচনা যে কিরূপ হাস্যকর বিষয় হয় 'রামায়ণ সমালোচনা' তার সার্থক দৃষ্টান্ত

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর ঃ

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর দেশীয় সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহার বেনামতুর রচনা 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর'।

৫। **NEW YEAR'S DAY :**

বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতিকে অনুকরণ করে রামবাবু ইংরেজী নতুন বছরে শ্যামবাবুকে 'হা ডু ডু' বলে সম্ভাষণ জানালে স্ত্রী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। স্ত্রী ভেবেছিল এই বয়সে তার স্বামী 'হা ডু ডু' খেলে বিপদ ডেকে আনবে। রামবাবু স্ত্রীকে বিষয়টি বোঝাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বলে — "আঃ পাড়াগেঁয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা গেল! ওগো হাঁ ডু ডু ডু নয়; হা ডু ডু অর্থাৎ How do ye do উচ্চারণ করিতে হয়, 'হা ডু ডু'!" [১] আমাদের দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভুলে ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে অনুকরণ করার ব্যঙ্গধর্মী রচনা 'NEW YEAR'S DAY'।

৬। হনুমদ্বাবুসংবাদ ঃ

দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতিতে মুগ্ধ বাবু সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণপ্রিয় বাবুদের স্বদেশীয় স্বাধীনতা অর্জনের অলীক স্বপ্নকে ব্যঙ্গকরা হয়েছে।

৭। বাবু ঃ

উনিশ শতকে ইংরেজী সভ্যতার আলোকরশ্মিতে মুগ্ধ একটি সম্প্রদায়, যারা অনুকরণ প্রিয়, মাতৃভাষা-বিরোধী পরভাষাপ্রেমী, আহার-নিদ্রা কুশলী, নেশাখোর, বেশ্যাগৃহে গমনপ্রিয় প্রভৃতি অসদ্গুণে দুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব মেরুদণ্ডহীন, সুখ-স্বপ্ন বিলাসী ব্যক্তিদের 'বাবু' বলে চিহ্নিত করেছেন

কমলাকান্ত (১২৯২ বঙ্গাব্দ) ঃ

'কমলাকান্ত' গ্রন্থটির তিনটি অংশ 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস 'কমলাকান্তের দপ্তর' সম্বন্ধে বলেন:— "...কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। ...এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন,

তাঁহারই নিদ্রা আসিবে।"[৩২] বঙ্কিমচন্দ্র এরকম বিরোধাভাসমূলক বক্তব্য দিয়ে কমলাকান্তের সূচনা করেন। গ্রন্থটি পাঠ করলে দেশ, জাতি, সম্বন্ধে অজ্ঞানতার নিদ্রা ভঙ্গ হবে—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বলা যায় 'কমলাকান্ত' নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলার রসসমৃদ্ধ রচনা।

কমলাকান্ত সমাজের আর দশটি মানুষের থেকে আলাদা। সেজন্য তাকে পাগল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে তথাকথিত পাগল বলতে চান নি; তাঁকে সত্যদ্রষ্টা, পথপ্রদর্শক, নীতি ও কর্তব্যসচেতন মনীষী হিসাবে চিত্রিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রটিকে মানুষ ঠিক মূল্যায়ন করবে। কেননা 'কমলাকান্ত'-এর মূল কথা পরিহাস, রসিকতা বা রঙ্গব্যঙ্গই নয়, এর আবেদন অনেক গভীরে। বলা যায়— দেশবাসীকে নীতি ও দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত করা ও ঘুমন্ত জাতিকে কৌশলে জাগানোর সদিচ্ছা 'কমলাকান্ত'-এর আবেদনে প্রকাশ পেয়েছে। 'কমলাকান্ত'-এর কয়েকটি রচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

১। একা "কে গায় ওই ?" ঃ

সঙ্গীত আনন্দের উৎস। সংসার সঙ্গীতও আনন্দেপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমে ও মানব-প্রেমে একটি মহানন্দ আছে। এই আনন্দ জীবনের পরশমণি। এখানে কমলাকান্তের গূঢ় রহস্যালাপের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র পরহিত ব্রতের নীতিকথাকেই তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—"পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।"[৩৩] বলা বাহুল্য — এই নীতি কথা মানুষকে আত্মসর্বস্ব থেকে বিরত হওয়ার আহ্বান জানায়।

২। বিড়াল ঃ

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমান অধিকারের অস্তিত্ব নেই। দরিদ্রতা — ধনী শ্রেণীর নির্দয়তা ও কৃপণতার ফল। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধনীকে তার অর্জিত ধন সাধ্যানুসারে দরিদ্রের কাজে লাগাতে হবে। 'বিড়াল' রচনাটিতে কতগুলি প্রসঙ্গ আছে, যা পাঠককে গভীরভাবে ভাবাতে বাধ্য করে । যথা;— "চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন? "[৩৪] কিংবা, "তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ — দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না।"[৩৫] বলাবাহুল্য — এই সব একাধিক প্রশ্ন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাম্যবাদী মনের প্রতিবাদ। রচনাটি মানবিকতার তত্ত্বে সমৃদ্ধ, যা অনুভূতিপ্রবণ মানুষের নিকট যথেষ্ট মর্মস্পর্শী।

৩। ফুলের বিবাহ ঃ

এ পৃথিবীতে জীবন-যৌবন-ধন-মান কোন কিছুই স্থায়ী নয়। 'ফুলের বিবাহ' রচনাটিতে এরকমই একটি দার্শনিক নীতিকথা ব্যক্ত হয়েছে।

৪। স্ত্রীলোকের রূপ ঃ

কমলাকান্ত ভারতীয় নারীর চিরন্তন গুণাবলী চর্চার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, নারীর রূপ চর্চা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। রূপ চর্চায় কোন ইতিবাচক দিক নেই,—এতে নারী মহিমান্বিত না হয়ে বরং ভোগ্য বা দাসীতে রূপান্তরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—

> "রূপ রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ...ইহাতেই মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব। ... আমি শুনিতে চায় যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে, লক্ষগুণে, কোটীগুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চায় যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি।"[৩৬]

তাই কমলাকান্ত বঙ্গদেশের নারীদের রূপচর্চার পরিবর্তে সেবা, শুশ্রূষা, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ প্রভৃতি গুণের অধিকারী হয়ে দেশ ও সমাজ গঠনে সহায়ক হবার আহ্বান করেন।

৫। আমার মন ঃ

পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশের মানুষগুলিকে ধন, মান, যশ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মতো বাহ্যসুখমুখী ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। এই বাহ্যসুখমুখিনতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে পরার্থপরতার নৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য 'আমার মন' রচিত হয়। কেননা, কমলাকান্ত বলেছেন;—"আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।"[৩৭]

৬। আমার দুর্গোৎসব ঃ

এখানে বঙ্গমায়ের পরাধীনতার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। তবে বলা হয়েছে, এখন বঙ্গভূমি নিঃস্ব হলেও একদিন বাঙালী তাকে ঐশ্বর্যময়ী করে তুলবে। এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা। 'আমার দুর্গোৎসব' রচনাটিতে বাঙালীকে সচেতন করার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। বিষন্নতার সঙ্গে বলা হয়েছে—"মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"[৩৮] বঙ্গমায়ের পরাধীনতার জন্য দায়ী অলসতা, অধর্ম, ভাতৃবিরোধ, ইন্দ্রিয়াসক্তির মতো বিষয়কে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। রচনাটিতে প্রত্যক্ষ স্বদেশপ্রেম ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

৭। একটি গীত ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনাটিতে গভীর মর্মবেদনা ধ্বনিত হয়েছে। এ বেদনা দেশমাতৃকার পরাধীনতার জন্য এক সুসন্তানের অন্তর্বেদনা। ১২০৩ সালের যেদিন থেকে যবন এদেশের স্বাধীনতা হরণ করেছিল সেদিন

থেকেই বাঙালীর সমস্ত সুখ কালগ্রাসে পরিণত হয়েছে। আজ দেশজননীর ঐশ্বর্য লুপ্ত, শুধু রয়েছে স্মৃতিটুকু। আর সেজন্যই স্বদেশপ্রাণ সন্তানের বক্তব্য বাঙালীর সুখের কথায় কোন অধিকার নেই।

৮। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব ঃ

আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অনুগ্রহ আদায়ের দ্বারা বেঁচে থাকার মতো পৌরুষহীনতাকে লক্ষ করে 'বাঙালীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি রচিত হয়। একটি অংশে কালো ভ্রমর বলেছে;— "দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমি শুধু ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করি না — মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই"[৩৯] কালো ভ্রমরের এই বক্তব্যের দ্বারা সমকালীন বাঙালীর ব্যক্তিত্বহীনতার ছবি স্পষ্ট হয়েছে।

৯। কমলাকান্তের জোবানবন্দী ঃ

একদিকে মানবিকতা, দরদ ও সহানুভূতি আর একদিকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার প্রতি বিদ্রূপমূলক বিষয় রহস্যময়তার দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে। বিষয়টি কমলাকান্তের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। কমলাকান্ত বলেন;—"গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকেন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একাটা right নয়? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইন মতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গরু ছাড়িয়া দাও।"[৪০]

অতএব 'কমলাকান্ত' গ্রন্থটি মানবিকতা বোধ, দেশপ্রেমের ভাবনা, নেতিবাচক বাঙালী মনোভাবের সমালোচনা প্রভৃতি নানামুখী ভাবনায় সমৃদ্ধ। যার মূল লক্ষ বাঙালীর চেতনার বিকাশ ঘটানো। এবং যাকে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা বললে অতিশয়োক্তি হয় না।

মুচিরামগুড়ের জীবনাচরিত (১৮৮০) ঃ

অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চপদ প্রাপ্তি 'মুচিরামগুড়ের জীবনাচরিত' এর বিষয়। ভাগ্যের সহায়তায় অনেকসময় বড় হওয়া যায়, মুচিরাম তার দৃষ্টান্ত। এই রচনাটি একটি সামাজিক দলিল বিশেষ, যা নির্বাচকদের ভুলের ফলে ভাগ্যহত যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচিত না হওয়ার বিষন্নতাকে মনে করিয়ে দেয়। এখানে পদপ্রাপ্ত অযোগ্য ব্যক্তির পদাধিকারকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

বিজ্ঞানরহস্য অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ (১৮৭৫) ঃ

আধুনিক বিজ্ঞানকে এড়িয়ে বাঙালী জাতিকে সব্যসাচী করা যাবে না,—তা যুগচিন্তা নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি একাধিক রচনায় দৃপ্ত কণ্ঠে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বরণ করার আহ্বান জানান।

'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' নামক প্রবন্ধে লেখকের বিজ্ঞানানুশীলনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রবন্ধটিকে লেখকের বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগের মুখপত্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এতে একদিকে বিজ্ঞানকে বরণ করার প্রেরণা যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চার জন্য গৌরববোধ এবং সমকালের বিজ্ঞান-চেতনাহীনতার জন্য আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে। বাঙালী জীবনে বিজ্ঞান-চেতনাহীনতা প্রসঙ্গে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হতাশার সুরে বলেন;—

> "হা অদৃষ্ট! বিজ্ঞান অবহেলার এই ফল। বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু। ...যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে।"(৪১)

প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে বাঙালী জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানকে সাদরে বরণ করার আন্তরিক আবেদন ধ্বনিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানী নন্, লেখক। তাঁর আর একটি বড় পরিচয়— তিনি দেশপ্রেমিক। দেশবাসীর বিজ্ঞান-চেতনাহীনতা তাঁকে ব্যথিত করেছে। জাতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে বিজ্ঞান চেতনা জরুরি। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানচেতনার লক্ষে হক্সলী, টিণ্ডল, প্রকটর, লকিয়র, লায়েল প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব 'বিজ্ঞান রহস্য' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের বিষয় করেন। 'বিজ্ঞান রহস্য' বা 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ' এর প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে;—'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত', 'আকাশে কত তারা আছে?', 'ধূলা', 'গগন পর্য্যটন', 'চঞ্চল জগৎ', 'কত কাল মনুষ্য', 'জৈবনিক', 'পরিণাম-রহস্য', 'চন্দ্রালোক'।

উক্ত প্রবন্ধের বিষয়গুলি বাঙালী কোন দিন যে ভাবেনি, তা নয়। বাঙালী সমাজ যতটুকু জেনেছে— তার সবটাই প্রায় ভুলে ভরা। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর ভুল শুধরে দিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রবন্ধ গ্রন্থের অবতারণা করেন। বিজ্ঞাপনে প্রাবন্ধিক গ্রন্থের উদ্দেশ্যের বিষয়ে বলেন;—

> "এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্সলী, টিণ্ডল, প্রক্টর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে। ...লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রী বুঝিতে পারেন।"(৪২)

প্রাবন্ধিকের স্বীকৃতি থেকে স্পষ্ট —'বিজ্ঞানরহস্য' বাঙালীর বিজ্ঞানচেতনা জাগ্রত করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত।

বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮৭-১৮৯২) ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ দু-খণ্ডে বিভক্ত। প্রবন্ধ সংখ্যা ১৬+২২=৩৮টি। গ্রন্থটির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাবন্ধিক বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধকে স্থান দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল জাতির আত্ম-উন্মোচন ঘটানো। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জাতিকে প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশ দিয়েছেন। আবার কখনো আত্ম-বিস্মৃত জাতির ইতিহাস উদ্ধার করে আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। এখানেই শেষ নয়— ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর রচনাগুলিকে এখানে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হল। যথা;—

ক) নব-শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি পথ নির্দেশিকা।

খ) সামাজিক পথ নির্দেশিকা জাতীয়

গ) আর্থ-রাজনৈতিক ভাবনা

ঘ) ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক

ঙ) ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক

ক) নব-শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি পথ নির্দেশিকা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র জাতির দুরবস্থা দূরীকরণ কার্যে উনিশ শতকের সচেতন শিক্ষিত শ্রেণীকে সবসময় উৎসাহ দিতেন। 'বিবিধপ্রবন্ধ' গ্রন্থে 'লোকশিক্ষা', 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রভৃতি কয়েকটি রচনায় নব-শিক্ষিতের প্রতি পথনির্দেশিকার পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। লোকশিক্ষা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের পিছনে লোকশিক্ষার বিরাট অবদান থাকে। সমসাময়িক কালে লোকশিক্ষার মান লোপ পাওয়ায় জাতীয় জীবনের মান তলানিতে ঠেকেছিল। তিনি এর জন্য আধুনিক আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে অভিযুক্ত করেন। বলেন;—

> "অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।" (৪৩)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লোকশিক্ষার পূর্ব-প্রক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় হতাশ হয়েছেন। কিন্তু নিরাশ হন নি। তিনি বাংলার সুশিক্ষিত লোকেদের উপর সে দায়িত্ব অর্পণ করে বলেন;—"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে

ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।" (৪৪)
এভাবে শিক্ষিত ব্যক্তির নৈতিক চেতনার উন্নতি ঘটলে লোকশিক্ষা নবরূপে প্রবর্তন হতে পারে এবং জাতীয় জীবনের মান ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হবে।

২। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ঃ

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বাঙালী ও বাঙালীর সাহিত্য বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার নতুন লেখকদের প্রতি ১২ (বার)টি উপদেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে —টাকা ও যশের জন্য লিখতে বারণ করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মানুষের বা দেশের মঙ্গলের জন্য, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য, ন্যায় ও সত্যের জন্য প্রভৃতি বিষয়ে লেখার উপদেশ দিয়েছেন। নব্যলেখকের প্রতি তাঁর উপদেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়;—

> "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" (৪৫)

এই বক্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে মানুষের প্রয়োজনের সামগ্রী রূপে গণ্য করেন। অর্থাৎ সাহিত্য মানুষের প্রয়োজনে বা দেশের প্রয়োজনে অতিপ্রয়োজনীয় একটি সামগ্রী; কিংবা সৌন্দর্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে সাহিত্য একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করা পাপ। বঙ্কিমচন্দ্র মহৎ উদ্দেশ্যে বাংলার নব্য-লেখকদের মহৎ উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম হলে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এরকম;—"বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।"(৪৬)

অতএব বলা যায়, 'বাঙ্গালার নব্যলেখকদিগের প্রতি নিবেদন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র নব্যলেখকদের প্রতি নানা নীতি-উপদেশ দিয়ে দেশের মঙ্গল ও বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পরিকল্পনা করেন।

৩। বাঙ্গালা ভাষা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীকে উপদেশ দিয়েছেন; শিক্ষিত বাঙালীর সার বাঙালী লেখক,—তাঁদেরও উপদেশ দিয়েছেন; এবার বাঙালীর আদরের ধন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একাধিক যুক্তিপূর্ণ মতামত দিয়ে শেষে বলেন— প্রকাশিত বক্তব্যকে স্পষ্ট করা জরুরি। ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হলে অশ্লীল ভাষা, ভিন্ন ইংরেজী,

ফার্সি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষারই শব্দ হোক না কেন — প্রয়োজনে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। রচনাকে সৌন্দর্যে ভূষিত করা প্রয়োজন। কেন না, সুন্দর রচনা মনোগ্রাহী হয়। সহজ ভাষায় লেখার দিকে নজর দেওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার এরকম রীতির প্রতি সুগভীর আশাবাদী। তাঁর ভাষায়;—"ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। ...এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।"[৪৭]

খ) সামাজিক পথ নির্দেশিকা জাতীয় রচনা ঃ

দেশীয় সমাজে প্রচলিত কিছু আচার সংস্কার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিসিদ্ধ পথ-নির্দেশিকা বেশ কিছু প্রবন্ধের বিষয়।

১। অনুকরণ ঃ

বাঙালীর অতিরিক্ত অনুকরণপ্রিয়তা বিষয়ে উনিশ শতকের অনেক যুগচিন্তা নায়ক আশঙ্কিত ছিলেন। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রও অনুকরণকারীর দু'টি শ্রেণী করেছেন;— প্রতিভাশালীর অনুকরণ ও প্রতিভাহীনের অনুকরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র একমুখী আক্রমণাত্মক সমলোচনা না করে বলেন — প্রতিভাশালীর অনুকরণ সবসময় দোষের নয়। তাঁর ভাষায়;—"যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।"[৪৮] প্রাবন্ধিক বিশ্বাস করতেন সুপ্ত প্রতিভাশালী বাঙালী জাতি অনুকরণ করতে করতে একদিন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আসবেই। সঙ্গে সাবধানী বাণী শুনিয়ে বলেন—শুধু অনুকরণে মজে থাকলে সর্বনাশ হতে বাধ্য। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় স্বার্থে অনুকরণ নামক সামাজিক ব্যাধিকে নিষিদ্ধ না করে সমকালের রুগ্ন জাতির প্রয়োজনে অনুকরণকে স্বাগত জানান।

২। প্রাচীনা ও নবীনা ঃ

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে দেশীয় সমাজে যে আধুনিকতা প্রবেশ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে নির্বিচারে সমর্থন করেন নি। যাঁরা আধুনিক নারী-শিক্ষার সমর্থক, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন;— "যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে, আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্ম বন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন?"[৪৯] অনেক রুচিহীন আধুনিকতার চেয়ে তিনি অনেক প্রাচীন আচারকে সমর্থন করেন। সমকালের আধুনিক নারীর প্রকৃত পরিচয় এবং জাতীয় স্বার্থে তাদের গতিবিধি কতখানি অনুকূল — প্রবন্ধের বক্তব্যে তা তুলে ধরা হয়েছে।

তিনি যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেন — আধুনিক নারীগণ প্রাচীন নারীর তুলনায় অলস ও ধর্মহীন। এতে সমাজে নানারকম অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। যথা;—আধুনিকারা রুগ্ন, গৃহকার্যে অপটু, তাদের সন্তান-সন্ততি দুর্বল। এইসব ধর্মজ্ঞানহীন আধুনিকারা পতিব্রতা, অতিথি সেবা, দানশীলতা প্রভৃতি দেশীয় আচার প্রথায় নিরুৎসাহী। যে ধর্মপ্রাণতা বা ধর্মমনস্কতা জাতির বৈশিষ্ট্য —তা এদের জন্য ক্রমশ বিপন্ন প্রায়।

৩। বহুবিবাহ ঃ

'বহুবিবাহ' নিবারণ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সুচিন্তিত মত ও পথের সীমাবদ্ধতাকে বিষয় করে 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি রচিত হয়। বঙ্কিমের মতে — বহুবিবাহ নিবারণ করতে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয়যুক্তি নামক যে অস্ত্রটি ব্যবহার করেছেন, এককথায় সে কৌশল অসম্পূর্ণ। বিদাসাগরের বহুবিবাহ নিবারণের মতো সাধু উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করলেও সমাজ সংস্কারের পদ্ধতিকে মেনে নেন নি। অর্থাৎ শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা স্বজাতীর জন্য মহৎ কোন কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। পরোক্ষে সে কথাই বলা হয়েছে।

৪। রামধনপোদ ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী চরিত্রের তেজহীনতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বাঙালীর অপরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বাল্যবিবাহ, পরিবারের আয়ের অসংকুলান, একাধিক সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়ার প্রবণতা প্রভৃতি বিষয় বাঙালীকে ক্রমশ তেজহীন করে তুলেছে। বাঙালীর অধঃপাতে যাওয়ার ইতিকথা 'রামধনপোদ' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য।-বঙ্কিমচন্দ্র রামধনপোদের মতো অসচেতন ব্যক্তিদের সুপরিবার গঠনের কথা বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে হতাশার সঙ্গে বলেন;—"...এমন নির্ব্বোধ জাতি আর কোন দেশে নাই।"[৫০]

প্রবন্ধের শেষ বক্তব্যে শোনা যায়,— বাঙালী পরিবারের পরিকল্পনাহীনতাই জাতিকে ক্রমশ দুর্বল ও কূপমণ্ডুপ করে তুলেছে।

গ) আর্থ-রাজনৈতিক ভাবনা ঃ

দেশের অর্থনীতি-রাজনীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সুচিন্তিত ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে 'ভারত কলঙ্ক', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধে।

১। ভারতকলঙ্ক ঃ

ভারতবাসী দুর্বল জাতি; সেই জন্য দীর্ঘদিন পরাধীন। —এ কলঙ্কের তীব্র বিরোধিতা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বলেন, অধিকাংশ ভারতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। পারমার্থিক বিষয়কে এঁরা

যতখানি গুরুত্ব দিয়েছে, বর্হিজীবনের অন্তর্গত রাজনৈতিক বিষয়কে সামান্যতম গুরুত্ব দেয় নি। আসলে দেশের জাতীয় চরিত্র রাজনৈতিক বিক্রমকে সর্বাগ্রে স্থান দেয় নি।

তবে প্রাবন্ধিক আশার কথাও শুনিয়েছেন। নতুন যুগের নতুন শিক্ষা ভারতবাসীকে ক্রমশ রাজনৈতিক সচেতন করে তুলেছে। জাতির 'স্বাতন্ত্র্যতা' অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও জাতি হিতৈষণা বা দেশপ্রেমের মনোভাব রাজনৈতিক চেতনালাভের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক গুণ।

২। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে সাধারণ ভারতবাসীর রাজনৈতিক উদাসীনতার কথা বলেছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বলেন—প্রাচীন ভারতে প্রশাসকের নিকট রাজনীতি অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। প্রবন্ধের প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—

> "মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কত দূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।"(৫১)

বঙ্কিমচন্দ্র 'মহাভারত'-এর 'নারদবাক্য' থেকে তথ্য সংগ্রহ করে 'প্রচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটিতে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি প্রশংসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের সুশাসন ব্যবস্থার জন্য প্রাবন্ধিক পরোক্ষে গৌরববোধ করেন।

৩। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, শাসক স্বদেশীয় হলেই দেশের অধিকাংশ মানুষ সুখী হবে এমন নয়। সুপ্রশাসক বিজাতীয় হলেও দেশের অধিকাংশ মানুষ সুখী হতে পারে। প্রাচীন ভারতে শাসক স্বজাতীয় বা দেশীয় ছিল কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ সুখী ছিল না। অন্যদিকে উনিশ শতকের আধুনিক পরাধীন ভারতবর্ষে দেশীয় উচ্চজাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্বের সুযোগ সুবিধা হারিয়েছেন। দেশের পরাধীনতার পরেও বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা লাভের সুযোগ এসেছে এবং প্রাচীন ভারতের বর্ণবৈষম্যের দুঃষহ প্রকোপ এখন তত ভয়াবহ নয়। অতএব বিদেশী ইংরেজের নিকট দেশের পরাধীনতা শুধুই বেদনাদায়ক একঘেয়েমীর ইতিহাস নয়। বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার পরেও বর্ণ নির্বিশেষে দেশে শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরী হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

৪। বঙ্গদেশের কৃষক ঃ

বঙ্গদেশ পরাণ মণ্ডলদের দেশ। পরাণ মণ্ডল বাংলার অগণিত কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি মূলক চরিত্র — কৃষি যাঁদের একমাত্র জীবিকা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থ লালসার অন্যতম প্রকল্প 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ধীরে ধীরে বাংলার কৃষক শ্রেণীকে সর্বহারা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন—এই নতুন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের শতকরা দু-একজন মানুষের মঙ্গল হয়েছিল। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটিতে বাংলার অধিকাংশ মানুষের উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও নিষ্পেষণের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ) ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক ঃ

ধর্মের প্রকৃত রূপের পরিচয় এবং জীবনপথ চলার প্রকৃত দর্শন কিরকম হওয়া উচিত 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা;—

১। ধর্ম্ম ও সাহিত্য ঃ

সাহিত্য ও ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। ধর্মের প্রতি সমাজের সাধারণ মানুষের অনাগ্রহের জন্য প্রচলিত বিকৃত ধর্মীয় রূপকে দায়ী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—ধর্ম জীবনের উন্নতি সাধনের উপায় ও পরিপূর্ণ আনন্দলাভের প্রয়োজনীয় বস্তু। ধর্মের অনিবার্য ফল হল ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং আপন হৃদয়ে প্রশান্তি প্রাপ্তি। সাহিত্যে এগুলির আংশিক প্রকাশ থাকে। পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহী হবার আবেদন জানান।

২। চিত্তশুদ্ধি ঃ

'ধর্ম্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে জীবনের পরশমণির মতো শ্রেষ্ঠ অলংকার রূপে ব্যাখ্যা করেন। 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ধর্মকে লাভ করার কথা বলেছেন। চিত্তশুদ্ধির স্তরগুলি হল;— ইন্দ্রিয় সংযম, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। কারো জীবনে ইন্দ্রিয়সংযম, ঈশ্বরে ভক্তি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকলে তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে বলতে হবে। প্রসঙ্গত বলা যায়—বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ যে আদর্শের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন 'চিত্তশুদ্ধি' তার ক্ষুদ্রতম সংস্করণ।

৩। গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি ঃ

এই প্রবন্ধে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের গোঁড়ামী ও প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত মত এবং পথের ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়;—"...একজনই সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, এবং

সংহারকর্ত্তা। হিন্দুধর্ম্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই।"[৫২] তিনি লিখেছেন, হিন্দুধর্মে সর্বত্র সমদর্শী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর তাই জাত-পাত ভুলে বিধর্মী কছিমদ্দী সেখের বাড়িতে মুরগীর মাংস খাওয়ার মধ্যে কোনরকম অপরাধ দেখতে পান নি। আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রবন্ধটি আগাগোড়া নীতিকথায় পূর্ণ।

ঙ) ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস বিষয়ক রচনাগুলি দেশানুরাগের ফসল। বাঙালীর কোন ইতিহাস ছিল না —এটি একটি কলঙ্ক। বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় কলঙ্ক মোচনের জন্য প্রত্যেক সচেতন বাঙালীকে আহ্বান জানান। 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর 'বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র বলেন;—

> "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। ...যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, —সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি।"[৫৩]

'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

১। বাঙ্গালার ইতিহাস ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ভারতীয়দের ইতিহাসে অনীহা দীর্ঘকালের। কেননা, এঁরা অত্যন্ত দৈবানুগ্রহ। এঁদের ধারণা ইহজগতে সবকিছুর পিছনে মানুষ নয়, দেবতার হাত রয়েছে। সেজন্য তাঁরা মানুষের ইতিহাস রচনায় আগ্রহী নয়; যতটা আগ্রহী পুরাণ বা দেবতার ইতিহাস রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় জীবনে ইতিহাসের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি। তিনি বাঙালীর ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। যথা;—

এক	।	প্রাচীন বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপন।
দুই	।	বাঙালীর বিশাল সাম্রাজ্য ছিল।
তিন	।	১৭ জন সেনার দ্বারা তুর্কিদের বাংলা বিজয়ের কাহিনী মিথ্যা।
চার	।	পাঠান যুগে বাঙালীর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছিল। কেননা, তখনও বাঙালী পূর্ণ পরাধীন হয় নি।
পাঁচ	।	মুঘলদের দ্বারাই বাঙালীর পূর্ণ পরাধীনতা প্রাপ্তি।

এইসব তথ্যের দ্বারা ইতিহাসহীন বাঙালীর প্রাচীন গৌরব যেমন ব্যক্ত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে জাতির ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধান ও তার উদ্‌ঘাটনের মানসিকতা দেখা যায়।

২। বাঙ্গালার কলঙ্ক ঃ

বাঙালী দুর্বল;—বঙ্কিমচন্দ্র স্বজাতির প্রতি এরকম অভিযোগের প্রতিবাদ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—

> "যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন।"[৫৪]

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র নানা তথ্যের দ্বারা জাতির বীরত্বের প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বাংলার ইতিহাসের নানা তথ্য উদ্ধার করে বলেন — দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার এই বঙালীদের সমীহ করেছিলেন ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী মুসলমান শাসকগণ কোনদিন সমগ্র বাংলাকে পদানত করতে পারে নি। আরো অনেক তথ্যের উল্লেখ করে বঙ্কিম বাঙালীকে রাজপুত জাতির সঙ্গে তুলনা করেন।

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস ছিল, বাঙালীর ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস গৌরবের। তাই তিনি সেই ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষিত বাঙালীকে আহ্বান করেন। শুধু তাই নয়, কিভাবে এবং কি কি বিষয়ে গবেষণা করতে হবে তারও একটি প্রাথমিক খসড়া দেন। আসলে স্বজাতির ইতিহাস না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র অপমানবোধ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতির মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে ইতিহাসের একটি বড় ভূমিকা থাকে। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলেন;— "বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়, —হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? ...বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।"[৫৫] এখানে স্বজাতির ইতিহাসের জন্য অকৃত্রিম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

৪। বাঙ্গালীর উৎপত্তি ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বিষয়ে নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও গবেষণার দ্বারা শেষে একটি যুক্তিসিদ্ধ মত দান করেন। তাঁর মতে,—কোল বংশীয় অনার্য, দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য এবং আর্য বংশের মিশ্রণে বাঙালীজাতির উৎপত্তি। তিনি সমীক্ষা করে সমকালের বাঙালীর চারটি অংশের নির্দেশ করেন, যথা;—বিশুদ্ধ আর্য, অনার্য হিন্দু, আর্য অনার্য এবং মুসলমানধর্মে দীক্ষিত একটি জনগোষ্ঠী।

আমরা 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে জানতে পারি— বাঙালী মানে দু-চারজন আর্য বংশীয় ব্রাহ্মণ নয়, বাঙালী জাতি একটি মিশ্রিত জাতি।

অতএব 'বিবিধ প্রবন্ধ' আলোচনা শেষে বলা যায়, নবশিক্ষিত বাঙালীকে সঠিক পথ-নির্দেশ, সাধারণ বাঙালীকে সামাজিক পথ-নির্দেশ, দেশীয় মানুষের নিকট আর্থ-রাজনৈতিক ভাবনার প্রচার, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে ভাবনার প্রচার এবং দেশীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে লেখকের মনোভাবে সুগভীর স্বদেশ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর একমাত্র উদ্দেশ্য দেশবাসীর মঙ্গল সাধন। কখনো তা বাঙালীকে সঠিক পথনির্দেশের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে, কখনো দেশীয় আচার-সংস্কৃতি-ইতিহাস প্রচারের দ্বারা চেতনার বিকাশ ও আত্মবিশ্বাস জাগরণের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে — যা স্বদেশ ভাবনারই নামান্তর।

সাম্য (১৮৭৯) ঃ

এদেশের সাধারণ নরনারীর অধিকারের অন্যায় বৈষম্যে বঙ্কিমচন্দ্র গভীরভাবে ব্যথিত ছিলেন। 'সাম্য' প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের এই গভীর বেদনার শিল্পরূপ; এটি বৈষম্য সমাধানের আকাঙ্ক্ষায় রচিত।

ভারতবর্ষ এমনিতেই পরাধীন। তার উপর বৈষম্য নামক অপ্রাকৃতিক একাধিক কারণের জন্য সমাজের অধিকাংশ মানুষ নির্যাতিত। এরা হলেন এদেশের কৃষক সম্প্রদায় ও এদেশের নারী সম্প্রদায়।

কৃষি প্রধান এই দেশে প্রায় সবাই কৃষক। এইসব কৃষকদের নানান দুর্দশার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়; তার প্রতীকী চরিত্র পরাণ মণ্ডল। অনেক ক্ষেত্রে 'জমীদার', নায়েব, গোমস্তা, ইজারাদার, পত্তনিদার, মহাজন প্রভৃতি পরগাছা শোষক শ্রেণীর লোভে দেশের কৃষকের যে দুর্দশা ঘটে — সেই চিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অঙ্কন করেছেন।

পরিশেষে প্রজা-হিতৈষী স্বদেশ প্রেমিক জমিদারের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র আবেদন করেন—তাঁরা যেন এই অত্যাচারের ইতি টানতে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর ভাষায়;—"এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগের হাত। ...জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ।"[৫৬] বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেন—"সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা।"[৫৭] অর্থাৎ বাংলার অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায় জমিদারী অরাজকতার হাত থেকে যেন রক্ষা পায় — 'সাম্য' গ্রন্থ রচনার এটি একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের নারী সমাজ দীর্ঘদিন ধরে অপমানিত, অবহেলিত, নির্যাতিত। বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন;— "স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত ইহা আমরা স্বীকার করি না।"[৫৮] বঙ্কিমচন্দ্র বলেন — পুরুষের মতো নারীরও শিক্ষার অধিকার, পুনর্বার বিবাহের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি থাকা উচিত।

দেশীয় নারী সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ অন্যায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন শিক্ষিত শ্রেণীকে

এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। কেননা তিনি জানতেন, দেশের অর্ধেক অধিবাসী-নারী জাতির উন্নতি না হলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়।

'সাম্য' গ্রন্থটি দেশের কৃষক সম্প্রদায় ও নারী সম্প্রদায়ের সমর্থনে, তাদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত সচেতন পাঠক, নাগরিকের নিকট আন্তরিক আবেদন — যাকে জাতীয় দুরবস্থা মোচনের একটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ বলা যায়।

কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৫, ১৮৯২) ঃ

জাতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সুচিন্তিত পরামর্শের অন্যতম গ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র'। গ্রন্থটি রচনার পিছনে লেখকের মূলত দু'টি উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ এদেশের মানুষের নিকট ঈশ্বররূপে কল্পিত কিন্তু লোকসমাজে তাঁর চরিত্র বড় কলঙ্কিত। সাধারণ মানুষ জানে — শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে চোর (ননীচোর), যৌবনে ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং পরিণত বয়সে ছলচাতুরী দ্বারা অন্যকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রচলিত কলঙ্কের কথা মানতে পারেন নি। তাঁর মতে কোন দেশের ঈশ্বরের চরিত্র এরকম হলে —তা জাতীয় কলঙ্কেরই তুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, প্রচলিত কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনা আসলে তৃতীয় শ্রেণীর কবিকল্পনা অথবা প্রক্ষিপ্ত রচনা কিংবা তাতে কোন গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। তিনি বলেন;—

> "জানিয়াছি ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না। কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য।"(৫৯)

দ্বিতীয়তঃ, বাঙালী ইতিহাস চেতনাহীন। আদর্শ জীবনযাপনের জন্য বাঙালীর নিকট ইতিহাসের কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র পরিকল্পনা করেন জাতীয় মুক্তির জন্য চাই সার্থক দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র অলোচ্য গ্রন্থে জাতীয় জীবনের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন। এবং বলেছেন — "কেন না, "অনুশীলন ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। ...কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ;"(৬০)

বলা যায়— ঈশ্বররূপে কল্পিত শ্রীকৃষ্ণের প্রচলিত কলঙ্কের অবসান ঘটানো ও ইতিহাসহীন বাঙালীর আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন মেটানো 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

অনুরূপ আরেকটি গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, স্বদেশের পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য গীতার আদর্শ অনুসরণ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য তিনি 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এবিষয়ে তিনি বলেন;—

> "এখন আমাদিগের "শিক্ষিত" সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা প্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রচীন ভারতবর্ষীয়া চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্ত্যভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।"(৬১)

এসব বক্তব্যের সাহায্যে খুব সহজেই বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বদেশীয় দর্শনে অনুরাগী হওয়ার আহ্বান জানান।

এই প্রসঙ্গে 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর উল্লেখ করা খুবই জরুরি। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' একটি দার্শনিক গ্রন্থ। গ্রন্থের নামকরণ থেকে বোঝা যায়, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' জাতিকে ধর্মবিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। তবে মনে রাখা উচিত— সমকালে প্রচলিত সংকীর্ণতা, আচার-সর্বস্বতা প্রভৃতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর মতো গ্রন্থের অবতারণা নয়। আমরা লক্ষ করব, 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের বাঙালীকে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি দর্শন প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থটি গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত। গুরু ও শিষ্যের নানা গুরুগম্ভীর আলোচনার দ্বারা দর্শনটি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ধর্ম বিষয়ে বলা হয়েছে;—

"শিষ্য। তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম।"(৬২)

কিংবা, মানুষের ধর্ম বিষয়ে গুরু বলেছেন;—

"গুরু। মানুষের ধর্ম্ম কি? শিষ্য। এক কথায় কি বলিব? গুরু। মনুষ্যত্ব বল না কেন?"(৬৩)

গুরুশিষ্যের কথোপকথনে স্বদেশ প্রেমের প্রসঙ্গটিও এসেছে;—

"শিষ্য। ...আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।
যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"(৬৪)

'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর উপসংহারে চুম্বকাকারে মানুষের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় আছে।

শিষ্য বলেছেন;—

"৫।...ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।"(৬৫)

—এখানে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শনের নিগূঢ়তম তত্ত্বকথাকে যুগোপযোগী করে ব্যক্ত করেন। এই তত্ত্বকথা যে প্রচলিত আচার সর্বস্ব নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। এখানে ধর্ম বলতে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে একাধিকবার স্বদেশ প্রীতিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় নিহিত আছে; সে বঙ্কিমচন্দ্র হলেন—ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির একান্ত অনুরক্ত বঙ্কিম ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক এক বঙ্কিম।

রাজনারায়ণ বসু

উনিশ শতকে 'ভাঙ্গাগড়ার' যুগে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি রামমোহন, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুগচিন্তা-নায়কের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য রাজনারায়ণের পিতা নন্দকিশোর বসু রাজা রামমোহনের পারিষদ ছিলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের ফলে রাজনারায়ণ ডিরোজিও-এর ভাবধারায় আসক্ত হন। এবং দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করায় তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শ পান। অতএব উনিশ শতকের বিখ্যাত যুগচিন্তা-নায়কের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবনা তাঁকে প্রভাবিত করবে —একথা বলাই বাহুল্য।

রাজনারায়ণ বসু জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষকতায় যুক্ত ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজেও শিক্ষকতা করেছিলেন। অবশ্য প্রথম জীবনে তত্ত্ববোধিনী সভায় ছয় মাসের জন্য উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদক ও পরে বেশ কিছু সময় ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ কর্মে নিযুক্ত হন। রাজনারায়ণ বসু উল্লিখিত পেশাগত কর্মের পাশে স্বদেশ-সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে ১৮৫১-১৮৬৬ পর্যন্ত কিছু কাজের তালিকা দেন। মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন, মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতি সাধন, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা সংস্থাপন, সুরাপান নিবারণ সভা সংস্থাপন, বালিকা বিদ্যালয়

সংস্থাপন প্রভৃতি রাজনারায়ণের জীবনের অন্যতম কাজ। রাজনারায়ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;— "রাজনারায়ণবাবু দিবারাত্র কার্য করিতেন। ভাঙ্গাগড়ার এক বিশেষ যুগে তিনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সকল প্রকার দেশের কার্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।"(৬৬) রাজনারায়ণ বসু বাংলায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

এখানে রাজনারায়ণের কয়েকটি গ্রন্থ অবলম্বনে ভাঙ্গাগড়ার যুগে তাঁর গঠনমূলক চিন্তার পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করা হবে। রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের বাংলা ভাষা চর্চা প্রসঙ্গে বলেন;—

> "রাজনারায়ণবাবুর বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্যের বিষয়। তিনি ডিরোজিয়োর শিষ্য, ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত ওই ভাষাতেই চিরদিন ভাব প্রকাশে অভ্যস্ত। অথচ তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মশক্তি নিয়োগ করেন।"(৬৭)

রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা', 'সে কাল ও এ কাল' 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' 'আত্মচরিত', 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' প্রভৃতি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা লক্ষ করব, রাজনারায়ণ বসু উল্লিখিত গ্রন্থে জাতিকে আত্মসচেতন করে তোলার প্রতি নজর দেন। আসলে তিনি সমকালের দিক্‌ভ্রান্ত বাঙালীর আত্মবিশ্বাস জাগাতে চেয়েছিলেন। বাঙালীকে যা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার প্রেরণা দেয়। এই মহৎ ও বৃহৎ কাজের জন্য রাজনারায়ণ বসু সমকালের চেতনাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন, দুর্বল বাঙালীকে উৎসাহ দেন, যাতে বাঙালী জীবনের উন্নয়নের জন্য প্রকৃত মত ও পথের সন্ধান পায়। রাজনারায়ণের বিখ্যাত কয়েকটি রচনা আলোচনা করে বিষয়টি স্পষ্ট করা হচ্ছে। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমে বলা যায় 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র (১৭৯৪ শকাব্দ) কথা। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'য় স্বজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরব করা হয়েছে। রাজনারায়ণ 'আত্মচরিত' গ্রন্থে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের বিষয়ে বলেন;—

> "একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, খ্রীষ্টীয়ধর্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে হিন্দুধর্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি হয়।"(৬৮)

আসলে রাজনারায়ণ ধর্মমতে ব্রাহ্ম হলেও হিন্দু স্বদেশবাসী থেকে নিজেকে ভিন্ন মনে করতেন না। এ বিষয়ে তিনি বলেন;—"হিন্দুধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি।"(৬৯)

'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'য় রাজনারায়ণ বসু দেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে আস্থা প্রকাশ করেন।

লেখক সতর্কতা অবলম্বন করে গ্রন্থটি রচনা করেন। কেননা, এখানে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। গ্রন্থটির বক্তব্য সামান্য এদিক ওদিক হলেই সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হত। কিন্তু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে বরং মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের একটি তালিকা দেন। তিনি বলেন — হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্মের প্রশস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়, হিন্দু ধর্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না, হিন্দুধর্ম কোন পেয়গম্বর স্বীকার করেনা, হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরকে হৃদয়ের ধন মনে করে উপাসনা করার কথা বলা আছে, হিন্দু ধর্মে যোগের দ্বারা উপাসনা করার বিধি আছে, হিন্দু ধর্মে নিষ্কাম উপাসনা করার কথা বলা আছে, হিন্দু ধর্মে সর্বভূতে দয়া করার উপদেশ আছে, এছাড়াও বলা হয়েছে পরকালের বিষয়ে হিন্দু ধর্ম শ্রেষ্ঠ, হিন্দু ধর্মের ঔদার্যগুণ সর্বাধিক, হিন্দু ধর্মে জীবনের প্রত্যেক কাজ ঈশ্বরকে স্মরণ করার উপদেশ আছে, হিন্দু ধর্মের সবকাজ অনুশাসন অনুসারে হয়, হিন্দু ধর্ম অতিপ্রাচীন, হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান ও বন্মোপাসনা গৌরব করার মতো। অথচ এমন একটি ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ দেশে ভিন্ন ধর্মের মাত্রারিক্ত প্রচার লেখক রাজনারায়ণকে আহত করেছিল। এবিষয়ে তিনি বলেন;— "ইদানীন্তন কোন কোন জাতি আসিয়া ধর্ম্মের কথা বলে, ধর্ম্মোপদেশ দেয়, সে যেন জেঠার নিকট জেঠামি করা।"[৭০] এই বক্তব্যে গ্রন্থকারের সুগভীর দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়। আমরা বলতে পারি — লেখক রাজনারায়ণের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশীয় ঐতিহ্যবাহী ধর্মের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' লেখকের স্বদেশ ভাবনার ফসল। সেজন্য তিনি গ্রন্থের সূচনায় হিন্দু ধর্মের অপপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যারা বলেন— হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিক প্রধান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম অদ্বৈতবাদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম সন্ন্যাস ধর্মের কথা বলে, হিন্দু ধর্ম কঠোর তপস্যার ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ঈশ্বরকে পিতামাতা বলে মনে করে না, হিন্দু ধর্ম নীরস ধর্ম, হিন্দু ধর্মে ত্যাগের কথা নেই, হিন্দু ধর্মে উপকার করার কথা নেই, হিন্দু ধর্ম জাতিভেদের কথা বলে — এরকম একাধিক প্রচলিত ধারণাকে রাজনারায়ণ তথ্য ও প্রমাণের দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। রাজনারায়ণ বলতে চেয়েছেন, এই ঐতিহ্যবাহী ধর্মের দেশ নতুন করে জেগে উঠবে। লেখকের ভাষায়;— "আমার এই রূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।"[৭১] গ্রন্থশেষে রাজনারায়ণের এরকম মন্তব্য এক সুগভীর তাৎপর্য বহন করে। সমস্ত গ্রন্থটিতে লেখক স্বদেশীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। তিনি দেশীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে বাঙালীকে সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। একে আমরা উনিশ শতকের বাঙালীর আত্মজাগরণের যুগে স্বদেশ ভাবনা বলে দাবী করতে পারি।

রাজনারায়ণের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'সে কাল আর এ কাল' (১৭৯৬ শকাব্দ)। লেখক 'সে কাল আর এ কাল' বলতে বুঝিয়েছেন;—"ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে

সময় তাহা ''সে কাল'' এবং তাহার পরের কাল ''এ কাল'' শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।''[৭২] লক্ষ করা যাবে এই 'সে কাল আর এ কাল' রচনার পিছনে লেখক রাজনারায়ণ বসুর উদ্দেশ্য ছিল। লেখক গ্রন্থের প্রথমেই বলেন;— ''অদ্যকার বক্তৃতা কেবল আমোদজনক হইবে এমন নহে, ইহাতে উপকারও লাভ হইতে পারিবে। কৌতুকচ্ছলে কতকগুলি হিতকর বাক্য বলা আমার অদ্যকার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য।''[৭৩] আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি? এবিষয়ে রাজনারায়ণ বসু 'প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন;—''অক্ষয়বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমি ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ইংরাজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই, ...পূর্ব্বে মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা থাকাতে সহসা অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।''[৭৪] গ্রন্থকার 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে দুই যুগের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা স্বদেশীয় পাঠককে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন। লেখক একালে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। কিন্তু এই পরিবর্তনকে দেশের প্রকৃত উন্নতি বলতে নারাজ। তাঁর ভাষায়;—''কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত অবনতি হইতেছে, তাহা বিচার করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।''[৭৫] লেখক 'সে কাল' ও 'এ কাল' এর ভালমন্দ দিকগুলি নিরপেক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেন। তিনি রাখঢাক না করে বলেন — একালে মাতৃভাষার চর্চা, স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তাবোধের উন্নতি চোখে পড়ার মতো। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা, নীতিশিক্ষার অভাব, শিল্প ও বাণিজ্যের মতো জীবিকার অভাব, অনুকরণপ্রিয়তা ও পিতৃভক্তিহীন, পানাসক্ত, 'অসরল', প্রতারক, স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ, বিলাসপ্রিয়ের মতো চরিত্র দোষ, আধুনিক নারীর একাধিক দোষের মধ্যে গৃহকার্যে নিপুণতার অভাব, শারীরিক পরিশ্রমে অনিচ্ছুক, দয়ামায়া ও পতি ভক্তির ক্ষেত্রে শিথিলতা; এছাড়া দেশীয় মানুষ রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার, ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিষয়ে একালের মানুষের অবনতি হয়েছে। লেখক রাজনারায়ণ বসু এইসব অবনতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও বাঙালীকে হতাশ হতে বারণ করেছেন। তিনি বলেন;—

> ''কিন্তু আমাদিগের নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে, যে হেতু আশাই সকল উন্নতির মূল। ...এই বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে সকলের নিকট ঘৃণিত; কিন্তু হয়ত এই বাঙ্গালী জাতি যাহা করিবে, ভারতবর্ষের আর কোন জাতি তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। হয়ত এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান জাতিহইয়া উঠিবে। ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।''[৭৬]

রাজনারায়ণ বসুর এই নীতি-উপদেশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সবই বাঙালীর উন্নতির জন্য। তিনি দুই যুগের ভালমন্দ দিকগুলি সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করে জাতির উন্নতির জন্য প্রকৃত মত ও পথের সন্ধান দেন।

রাজনারায়ণ বসুর এজাতীয় গ্রন্থকে আমরা উনিশ শতকের স্বদেশ ভাবনামূলক গ্রন্থ বলে অভিহিত করতে পারি।

রাজনারায়ণ বসুর স্বদেশ ভাবনার বিষয়ে আর একটি রচনা 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮)। এই রচনায় বিদ্যাপতির সময় থেকে উনিশ শতকের দুই বিস্ময়কর প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা আছে। রাজনারায়ণ বসু হোমার, প্লেটো, শেক্সপিয়ার প্রমুখ বিখ্যাত গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি পান নি। তিনি তাঁর মনের একটি অতৃপ্তির কথা বলেছেন;—

> "এক আশা অপূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য বিশাল খ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা; সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্য ক্ষরিত অমৃত রস পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সে আশা কবে পূর্ণ করিবে? সে তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষা-রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে।"(৭৭)

এই বক্তব্যে স্বদেশীয় ভাষার প্রতি রাজনারায়ণের সুগভীর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। লেখক এই রচনায় একাধিক নীতি-উপদেশ দিয়েছেন, যা মাতৃভাষার উন্নয়নের ভাবনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন;—"স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি যাঁহার অনুরাগ নাই, তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে?"(৭৮) কিংবা "জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।"(৭৯) এবং বাংলা গ্রন্থকার সম্বন্ধে তিনি বলেন;— "তাঁহারা হীন অনুকরণ রীতি পরিত্যাগ করুন। শিশু সন্তান যদি চিরকালই মাতার হাত ধরিয়া চলে, তবে সে কি কখন হাঁটিতে শিখিতে পারে? সেইরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা যদি চিরকাল ইংরাজদিগের হাত ধরিয়া চলেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা কখন মহৎ গ্রন্থকার হইতে পারিবেন?"(৮০) উল্লিখিত নীতি-উপদেশ সমকালীন বাঙালীকে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী হওয়ার প্রেরণা দেয়। যা লেখকের অকৃত্রিম স্বদেশ ভাবনা বলা যেতে পারে। কেননা, দেশীয় ভাষার উন্নতি স্বদেশের গৌরবেরই বিষয়।

অতএব রাজনারায়ণের দেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি দরদ তাঁর মনের সুগভীর দেশানুরাগকেই প্রকাশ করেছে — এমন দাবী করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি প্রকরণে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সাফল্য বিস্ময়কর। সারা জীবন ধরে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতির মতো তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। বালক বয়স

থেকে আশি বছর পর্যন্ত রাবীন্দ্রনাথের লেখনী ছিল সচল। তিনি আজীবন অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। যথা;— 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'রাজাপ্রজা' (১৮০০), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৬), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ বিংশ শতকে রচিত ও প্রকাশিত হয়। তবশ্য উনিশ শতকে রচিত ও প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ আছে। এখানে উনিশ শতকে রচিত প্রবন্ধে স্বদেশভাবনার আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ এবং 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' প্রবন্ধ গ্রন্থের আলোচনা করব। উনিশ শতকে রচিত অনেক প্রবন্ধ রয়েছে যেগুলি কোন গ্রন্থভুক্ত হয় নি। এবিষয়ে 'বিশ্বভারতী' থেকে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র সপ্তদশ খণ্ডে 'প্রকাশকের নিবেদনে' বলা হয়েছে;—

> "অগ্রন্থিত রচনাগুলি প্রকাশ করিবার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঊনত্রিংশ এবং ত্রিংশ খণ্ড (বর্তমান সপ্তদশ খণ্ড) সংকলিত হইল। এই খণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অগ্রন্থিত রচনাসমূহ পাওয়া যাইবে।" (৮১)

আমরা প্রথমে সপ্তদশ খণ্ডের অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলির উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার একটি পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকেই সাহিত্য, সংস্কৃতির মতো জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে সুচিন্তিত ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধ সাহিত্যে যুক্তির দ্বারা মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকেই বাঙালীর আত্মচেতনা বিকাশের জন্য যুক্তি দ্বারা কিছু নীতি উপদেশ দিয়েছেন। আমরা লক্ষ করব, উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, শিক্ষা বাঙালী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতনতা আনার চেষ্টা করেছেন। বলাবাহুল্য — লেখকের এই মনোভাব বাঙালী জীবনকে সমৃদ্ধ করতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি তথা সাহিত্যিক। সেজন্য প্রথমে আমরা সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণার পরিচয় নেব। তিনি বাঙালী জীবনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' নামক (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪) প্রবন্ধে সাহিত্য বিষয়ে বাঙালী পাঠককে সচেতন করার চেষ্টা করেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;— "গোটাকতক সন্দেশ খাইলে যে রসনার তৃপ্তি ও উদরের

পূর্তি-সাধন হয় ইহা প্রমাণ করা সহজ, ...কিন্তু সমুদ্রতীরে থাকিলে যে এক বিশাল আনন্দ অলক্ষ্যে শরীর-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্যবিধান করে তাহা হাতে হাতে প্রমাণ করা যায় না। ...সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য-সঞ্চার হয়। যুক্তি শৃঙ্খলের দ্বারা মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিবার তেমন কৃত্রিম উপায় নাই। সাহিত্য স্বত উৎসারিত হইয়া সেই যোগসাধন করে। ...আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ, এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।"[৮২] এখানে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ মানবতাকেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলেছেন। বলা চলে যে, মানবতার পরিচয়ের জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে গর্ব করে। অবশ্য অনেকে আছেন যারা সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিলোপ ঘটবে বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ এরকম ধারণার বিরোধিতা করেছেন। 'সাহিত্য ও সভ্যতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন;—

> "অনেক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেন যে, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিনাশ হইবে। তা যদি হয় তবে সভ্যতারও বিনাশ হইবে। কেবল পাকা রাস্তাই যে মানুষের পক্ষে আবশ্যক তাহা নয়, শ্যামল ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক; প্রকৃতির বুকের উপরে পাথর ভাঙিয়া আগাগোড়া সমস্তটাই যদি পাকা রাস্তা করা যায়, কাঁচা কিছুই না থাকে, তবে সভ্যতার অতিশয় বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অতিবৃদ্ধিতেই তাহার বিনাশ। লন্ডন শহর অত্যন্ত সভ্য ইহা কে না বলিবে, কিন্তু লন্ডন-রূপী সভ্যতা যদি দৈত্যশিশুর মতো বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত দ্বীপটাকে তাহার ইষ্টককঙ্কালের দ্বারা চাপিয়া বসে তবে সেখানে মানব কেমন করিয়া টিকে। মানব তো কোনো পণ্ডিত-বিশেষের দ্বারা নির্মিত কল-বিশেষ নহে।"[৮৩]

বরং সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সাহিত্যের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের মতে;—

> "যেমন বদ্ধ গৃহে থাকিলে মুক্ত বায়ুর আবশ্যক অধিক, তেমনি সভ্যতার সহস্র বন্ধনের অবস্থাতেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবশ্যকতা অধিক হয়। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম-শৃঙ্খল যতই আঁট হয়—হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি, ততই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সাহিত্যই সেই মিলনের স্থান, সেই খেলার গৃহ, সেই শান্তিনিকেতন।"[৮৪]

এখানে জীবনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। 'সাহিত্যের গৌরব' (সাধনা, ১৩০১, শ্রাবণ) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের গৌরব করতে গিয়ে বলেন;—"কিন্তু যথার্থ সাহিত্য যেমন যথার্থ জাতীয় ঐক্যের ফল

তেমনি জাতীয় ঐক্য সাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য।"[৮৫] এবং বাংলা সাহিত্যের গৌরব করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন;—

> "যাঁহারা বাংলার সদ্যোজাত সাহিত্যের শিয়রে জাগরণপূর্বক নিস্তব্ধ রজনীর প্রহর গণিতেছেন তাঁহারা কোনো উৎসাহ কোনো পুরস্কার না পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এক সুমহৎ আশা জাগ্রত দেবতার ন্যায় সর্বদা বরাভয় দান করিতেছেন, তাঁহারা একান্ত বিশ্বাস করিতেছেন যে, এই শিশু অমর হইবে এবং জন্মভূমিকে যদি কেহ অমরতা দান করিতে পারে তো সে এই সাহিত্য পারিবে।"[৮৬]

এখানে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের দ্বারা দেশমাতৃকার গৌরব বৃদ্ধির কথা শুনিয়েছেন। জাতীয় সাহিত্যকে ভালোবাসা জাতীয় ঐক্যের নামান্তর। উনিশ শতকের আত্মসচেতন বাঙালী জাতির অধঃপতনে গভীর আহত এবং তা থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করেছিলেন। এই সময়ে সাহিত্যকে ভালবাসার দ্বারা জাতীয় জীবনে উন্নয়নের কথা রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের গৌরব' নামক প্রবন্ধে শুনিয়েছেন।

বাঙালী সমাজে যথার্থ কবির অভাবে রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত। তিনি 'বাঙালী কবি নয়' (ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৭) নামক প্রবন্ধে বাঙালী সমাজে প্রকৃত কবির অভাবের কথা বলেন। তিনি বলেন —

> "সাধারণ কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, কবির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; সজনি, প্রিয়তমা, প্রণয়, বিরহ, মিলন লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে নূতন খুব কম থাকে এবং গাঢ়তা আরও অল্প। আধুনিক বঙ্গ কবিতায় মনুষ্যের নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রীড়া দেখা যায় না। বিরোধী মনোবৃত্তির সংগ্রাম দেখা যায় না। মহান ভাব তো নাইই। হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা ভাসা ভাব লইয়া কবিতা। সামান্য নাড়া পাইলেই যে জল-বুদ্‌বুদ্‌গুলি হৃদয়ের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। যে-সকল ভাব হৃদয়ের তলদেশে দিবানিশি গুপ্ত থাকে, নিদারুণ ঝটিকা উঠিলেই তবে যাহা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সহস্র ফেনিল মস্তক লইয়া তীরের পর্বত চূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে সে-সকল আধুনিক বঙ্গকবিদের কবিতার বিষয় নহে। তথাপি কী করিয়া বলি বাঙালি কবি?"[৮৭]

এখানে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালী কবিদের সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা সাধারণ সাহিত্য সমালোচনা নয়, এতে তাঁর আহত হৃদয়ের কথা ধ্বনিত হয়েছে। আসলে তিনি জানতেন, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি নিজের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে না। 'বাঙালি কবি নয় কেন?' (ভারতী, আষাঢ়, ১২৮৭) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী কেন কবি নয় তার যুক্তি সম্মত কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাবন্ধিক জাতির দুর্দশার মূল কারণ নির্ণয় করে লিখেছেন;—

"আমাদের এ পোড়া দেশে কাজকর্ম নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম নাই, আলস্য তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপাধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে, ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাস ফুল মোজা, কালাপেড়ে ধুতি, ফিন্‌ফিনে জামা পরিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া, পান খাইয়া ঠোঁট ও রাত্রি-জাগরণে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছে, এই তো চারি দিকের অবস্থা! এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান চরিত্র-চিত্রই বা কোথায় থাকিবে, আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কীরূপে বর্ণিত হইবে?"[৮৮]

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় চরিত্রের এরকম দুরবস্থায় মর্মাহত। তবে তিনি পাঠককে একেবারে হতাশ করেন নি। প্রবন্ধের শেষে তিনি জানিয়েছেন;—"সম্প্রতি বাহির হইতে একটা নূতন স্রোত আসিয়া এই স্থির জলের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। ইহা হইতে শুভ্র ফল প্রত্যাশা করিতেছি, ইতস্তত তাহার চিহ্নও দেখা দিতেছে।"[৮৯] —এখানে পাশ্চাত্যের প্রভাবে উনিশ শতকের বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কথা ব্যক্ত হয়েছে।

'আলস্য ও সাহিত্য' (ভারতী ও বালক, ১২৯৪ শ্রাবণ) সাহিত্য বিষয়ে বাঙালী পাঠককে সচেতন করার উদ্দেশ্যে রচিত। 'আলস্য ও সাহিত্য'-এ রবীন্দ্রনাথ বাঙালী পাঠককে সচেতন করে বলেন;—

"অবসরের মধ্যেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সাহিত্যের বিকাশ, কিন্তু তাই বলিয়া আলস্যের মধ্যে নহে।...সুকুমার বিকশিত পুষ্প যেমন সমগ্র কঠিন ও বৃহৎ বৃক্ষের নিয়ত শ্রমশীল জীবনের লক্ষণ তেমনি সাহিত্যও মানবসমাজের জীবন স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়,"[৯০]

সাহিত্যকে যারা কর্মহীনের বিষয় মনে করে, এই প্রবন্ধে তাদের মতের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

এছাড়া ধর্ম ও দর্শন ('আকার ও নিরাকার উপাসনা', 'ধর্ম ও ধর্ম নীতির অভিব্যক্তি', 'নব্যন্যায়তত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ), বিজ্ঞান ('সামুদ্রিক জীব', 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ', 'জীবনের শক্তি', 'মানব শরীর', 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য', 'অভ্যাস জনিত পরিবর্তন' প্রভৃতি প্রবন্ধ) শিল্প ('মন্দির পথবর্তিনী', 'মন্দিরাভিমুখে') সংগীত ('সংগীত ও ভাব', 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা') ও বিবিধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ বাঙালীকে আত্মসচেতন করার পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। উল্লিখিত ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সংগীত বিষয়ের প্রবন্ধের মধ্যে সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ 'সংগীত ও ভাব'-এর আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা লক্ষ করব, লেখক রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে সংগীত বিষয়ে বাঙালীকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছেন।

'সংগীত ও ভাব'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন;— "সংগীত মনোভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র।" [৯১]

অথচ সংগীত বলতে বাঙালী রাগরাগিণীকেই প্রাধান্য দেয়। লেখক প্রশ্ন করেন;—"রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল?" [৯২] উত্তরে স্বয়ং লেখকই বলেন;—"রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিণী উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[৯৩] দেশীয় সংগীতকে সমৃদ্ধ করতে রবীন্দ্রনাথ একটি যুক্তিগ্রাহ্য পরামর্শ দেন—"যে সাহিত্যে অলংকারশাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। ...আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।"[৯৪] লেখক মনে করেন, রাগরাগিণী থেকে মুক্ত হয়ে সঙ্গীতকে কবিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা উচিত। তাতে সংগীত যথেষ্ট সমৃদ্ধ হবে। উপসংহারে তিনি আরো বলেন;—

> "সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান ইমন-কল্যাণ কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ সুখ রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মূলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখদুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই-সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলা অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও রাগরাগিণীর শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাব-শিক্ষার ও শ্রেণী স্থাপিত হউক। এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন 'বাঃ, ইহার সুর কী মধুর', এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, 'বাঃ, কী সুন্দর ভাব'!"[৯৫]

অতএব সংগীত বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে, সংগীতকে ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম বাহন করে তোলার প্রতি মনোযোগ দিলে স্বদেশীয় সংগীত সমৃদ্ধ হবে —এরকম মনোভাব প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন। এবার আমরা 'আলোচনা' (১৮৮৫), 'সমালোচনা' (১৮৮৮) ও পরবর্তী শতকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অথচ উনিশ শতকে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের আলোচনা করে উনিশ শতকের প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার পরিচয় গ্রহণ করব।

প্রথমে 'আলোচনা' (১৮৮৫) গ্রন্থে স্বদেশ ভাবনার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'আলোচনা' প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছিলেন;—

> "আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ

নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছে।"[৯৬]

আসলে রবীন্দ্রনাথের সীমা অসীমের তত্ত্বকথা 'আলোচনা' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের পূর্ণতা দেখেছেন সীমা ও অসীমের মিলন সাধনের মধ্যে। এই সীমা ও অসীমের তত্ত্ব তাঁর কাব্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন;—"আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।"[৯৭] একথা অনস্বীকার্য রবীন্দ্রসাহিত্যে নানা তত্ত্ব-রহস্যের অবতারণা রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, রবীন্দ্রসাহিত্য লোকশিক্ষাও দিয়েছে। 'আলোচনা' গ্রন্থকে সেরকম লোকশিক্ষা জাতীয় গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়। কারণ এদেশে বাস্তবের সীমাকে ছেড়ে অসীমের জন্য নিস্ফল ক্রন্দন নতুন কিছু নয়। 'ডুবদেওয়া' প্রবন্ধের 'ছোটো বড়ো'র বিষয়ে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে অসীমকে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর ভাষায়;—

"একটি বালুকণাকে আমরা যদি জড়ভাবে দেখিতে পাই, তাহা কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই! তাহাকে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি বলিলেই কি তাহার সমস্ত নিঃশেষে বলা হইল, তাহার আর কিছুই বাকি রহিল না। তাহা কি অনন্ত জ্ঞানের সমষ্টি নহে, অনন্ত ইতিহাস অর্থাৎ অনন্ত সময়ের সমষ্টি নহে!...অতএব নিতান্ত জড় ভাবে না দেখিয়া মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকণার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় যে তাহা অসীম।"[৯৮]

রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' প্রবন্ধে 'জগতের বন্ধন' অংশে বলেন — অসীম জগতের থেকে কেউই বিচ্ছিন্ন নয়। এই প্রবন্ধে অসীম জগতের সঙ্গে ব্যক্তির অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়;—

"বিশ্ব-জগতের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিন্ন করিয়া ফেলা মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিন্ন করে কাহার সাধ্য! আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র?... অতএব আমাদের বুঝা উচিত জগতের বিরোধী হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা, জগতের সহিত আমাদের এতই ঐক্য।"[৯৯]

এই বক্তব্যের দ্বারা প্রাবন্ধিক অসীম জগতের সঙ্গে মানুষের ঐক্য দেখিয়াছেন। যা সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করার নামান্তর।

আমরা রবীন্দ্রনাথের 'আলোচনা' গ্রন্থে তত্ত্বকথার আড়ালে লোকশিক্ষার পরিচয় পাই। সমকালীন পাঠকের আত্মচেতনা উদ্বোধনের পক্ষে যা সহায়ক। এই আত্মচেতনা বাঙালীর জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করবে,

সেকথা বলাই বাহুল্য। 'ধর্ম' প্রবন্ধে 'সচেতন ধর্ম' অংশে বলা হয়েছে;—"পরার্থপরতাই এ জগতের ধর্ম। এই নিমিত্তই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা।"[১০০] একই রকম নীতিকথা 'আত্মা' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। 'শ্রেষ্ঠ অধিকার' নামক আলোচনায় বলা হয়েছে;—"আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জন করিতে পারে।"[১০১] 'আত্মার অমরতা' আলোচনাতেও বলা হয়েছে;—"আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা।"[১০২] আলোচ্য 'আলোচনা' প্রবন্ধগ্রন্থে সীমা-অসীমের রহস্যের পরেও রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত একাধিক নীতি-উপদেশ পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। এজাতীয় নীতি-উপদেশ পাঠকের চেতনাকে সুপথে চালিত করবে, যা মানব সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

'সমালোচনা' (১৮৮৮) রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম দিকের প্রবন্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল — 'অনাবশ্যক', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'নীরবকবি ও অশিক্ষিত কবি', 'সংগীত ও কবিতা', 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা', 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', 'বাউলের গান', 'সমস্যা' প্রভৃতি। 'সমালোচনা'য় সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম ভাবনা চোখে পড়ে। তাঁর এই দায়িত্ববোধ পাঠককে সচেতন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। প্রসঙ্গত 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধের কথা বলা যায়। এখানে শিক্ষিত শ্রেণীর স্বজাতীয় ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞানতার সমালোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;—

> "আমাদের আচার ব্যবহারে কতকগুলি চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেগুলি ভালোও নয় মন্দও নয়, কেবল দোষের মধ্যে তাহারা অনাবশ্যক — ...মনে করিলে, তুমি কতকগুলি অর্থহীন অনাবশ্যক হাস্যরসোদ্দীপক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে মাত্র, কিন্তু আসলে কী করিলে! সেই অর্থহীন প্রথার মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত সুমহৎ অতীতদেবকে ভাঙিয়া ফেলিলে, একটি জীবন্ত ইতিহাসকে বধ করিলে, তোমার পূর্বপুরুষদিগের একটি স্মরণচিহ্ন ধ্বংস করিয়া ফেলিলে। তোমার কাছে তোমার মায়ের যদি একটি স্মরণচিহ্ন থাকে, বাজারে তাহার দাম নাই বলিয়া তোমার কাছেও যদি তাহার দাম না থাকে তবে তুমি মহাপাতকী।"[১০৩]

'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে দেশীয় আচার-সংস্কৃতির মধ্যে যে নিজস্বতা রয়েছে, তাকে একেবারে অনাবশ্যক ভেবে বর্জন করার মনোভাবকে সমালোচনা করা হয়েছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সমালোচনা করা হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এবিষয়ে লজ্জিত হন। যাই হোক্,

প্রবন্ধের শেষে তরুণ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ মহাকবিদের উদ্দেশ্যে যা বলেছেন, তাতে তাঁর মনের অকৃত্রিম দেশপ্রেম ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। লেখকের ভাষায়;—

> "হে বঙ্গ মহাকবিগণ! লড়াই-বর্ণনা তোমাদের ভালো আসিবে না, লড়াই-বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙালিদের মানুষ হইতে শিখাও।"(১০৪)

এই সমাপ্তি বাক্যে সমকালীন যুগসংকট প্রকাশ পেয়েছে। আত্মসচেতন প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, উনিশ শতকের বিপন্ন বাঙালীকে সুপথে চালিত করতে হলে চাই মানবিক আদর্শ। এই মানবিক আদর্শ প্রচারে কবির বড় ভূমিকা থাকে। রবীন্দ্রনাথের এজাতীয় ভাবনা দেশীয় মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য, —একথা বলাই বাহুল্য।

'সমালোচনা' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্যতম প্রবন্ধ 'বাউলের গান'। এই প্রবন্ধে স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর দরদ প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালীর নিজস্বতাকে প্রাবন্ধিক সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়;—

> "আমাদের মনে হয় যে, বাঙালি জাতির যথার্থ ভাবটি যে কী তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই—বাঙালি জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে তাহা আমরা ভালো জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। ...ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙালির ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই!"(১০৫)

এই বক্তব্যে কবি তথা লেখক রবীন্দ্রনাথ যেন আত্মসমালোচনা করেছেন। এই আত্মসমালোচনা দেশীয় সাহিত্যকে মনের মতোসমৃদ্ধ করতে না পারার সমালোচনা। সংস্কৃত ভাষা কিংবা ইংরেজী ভাষার মধ্যে যারা বাংলা ভাষার পরিপূর্ণতা খোঁজেন, তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

> "সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাংলা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাংলা নাই, বাংলা ভাষা বাঙালিদের হৃদয়ের মধ্যে আছে। ছেলে কোলে করিয়া শহরময় ছেলে খুঁজিয়া বেড়ানো যেমন, তোমাদের ব্যবহারও তেমনি দেখিতেছি। তোমরা বাংলা বাংলা করিয়া সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সংস্কৃত ইংরাজি সমস্ত ওলট্-পালট্ করিতেছে, কেবল একবার হৃদয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ নাই।...আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।"(১০৬)

উল্লিখিত বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক বলেন;—"আমাদের সাহিত্য যদি বাঁচিতে চায়, তবে ভালো করিয়া বাংলা হইতে শিখুক।"[১০৭] এখানে দেশীয় সাহিত্যকে বাঁচানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের সুগভীর ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মতে;—"ভাবের ভাষার অনুবাদ চলে না।"[১০৮] এবিষয়ে প্রাবন্ধিক একটি সুপরামর্শ দিয়েছেন;—"বাংলা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"[১০৯] অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বাঁচাতে বাঙালীর নিজস্ব ভাব ও ভাবের ভাষা সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অতএব বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'বাউলের গান' দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার একটি পরামর্শমূলক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সমাজের উন্নয়নের জন্য সমাজ বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা উনিশ শতকের কিছু প্রবন্ধের আলোচনা করে বাঙালী সমাজের উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পরিচয় গ্রহণ করার চেষ্টা করব। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল — 'পারিবারিক দাসত্ব', 'বাঙালির আশা ও নৈরাশা', 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার', 'অকাল কুষ্মাণ্ড', 'হাতে কলমে', 'সমাজে স্ত্রী পুরুষের প্রেমের প্রভাব', 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' প্রভৃতি।

এ বিষয়ে প্রথমে 'পারিবারিক দাসত্ব' (ভারতী, চৈত্র, ১২৮৭) প্রবন্ধের কথা বলা যায়। প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অকাট্য যুক্তির দ্বারা বলতে চেয়েছেন, প্রচলিত সমাজ বা পরিবার বাঙালীকে দাসত্বের শিক্ষা দেয়। তাঁর ভাষায়;—

> "আমরা যে প্রতি পরিবারে এক-একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি! আমরা যে আমাদের সন্তানদের— আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শৈশবকাল হইতে চব্বিশ ঘণ্টা দাসত্ব শিক্ষা দিতেছি! বড়ো হইলে তাহারা যাহাতে এক-একটি উপযুক্ত দাস হইতে পারে, তাহার বিহিত বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; বড়ো হইলে যাহাতে কথাটি না কহিয়া তাহারা তাহাদের প্রভুদের মার ও গালাগালিগুলি নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিতে পারে, এমন একটি অসাধারণ পরিপাক-শক্তি তাহাদের শরীরে জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে! এইরূপে ইহারাও বড়ো হইলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া একটা তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, অথচ অধীনতাকে আপনার পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে দুধ-কলা সেবন করাইবে! প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপরে স্বাধীনতার আসন।"[১১০]

আসলে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বাঙালী পরিবারে ভয়ের দ্বারা সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার প্রথাকে আক্রমণ করেন। তিনি লিখেছেন;—

"ছেলেবেলায় যে আমরা শিক্ষা পাই যে, গুরুজনদের ভক্তি করা উচিত, তাহার অর্থ কী ? না গুরুজনদের ভয় করা উচিত!...কেন ভয় করিবে? না তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কোন মতে পারিয়া উঠি না। এইজন্যই, যখনি ছেলেরা দশজনে সমবয়স্কদের লইয়া মনের আমোদে খেলা করিতেছে, এবং যখনি গুরুজন বলিয়া উঠিয়াছেন, 'কী তোরা গোলমাল করছিস।' তখনি তাহারা তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়।"(১১১)

বাঙালী সমাজে শিশুদের শিক্ষার সময়ে ভয় দেখানোর কুফল সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোকপাত হয়েছে। যে শিক্ষা একটি শিশুর পক্ষে সুনাগরিক হওয়ার প্রতিবন্ধক। সেই জন্য লেখক প্রচলিত সমাজের সমালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

"আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কী? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। ...লোক মুখে শুনা গিয়াছে অনেক স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে। এমন হাস্যজনক কৃত্রিম অভিনয় তো আর দুটি নাই। কিন্তু এ ভাবটি আমাদের পরিবারের ভাব।"(১১২)

রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য পরিবারে তথা সমাজে প্রচলিত ভয়ের দ্বারা শিক্ষাদানের রীতির সমালোচনা করেন।

'নিমন্ত্রণ সভা' (ভারতী, আষাঢ়, ১২৮৮) প্রবন্ধে দেশীয় সমাজে নিমন্ত্রণ ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন;—"দশটা বাঙালিকে একত্রে জড়ো করিবার প্রধান উপায় আহারের লোভ দেখানো, বাঙালিদের অপেক্ষা আরও অনেক ইতর প্রাণীকেও ওই উপায়ে একত্রিত করা যায়।"(১১৩) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এদেশে নিমন্ত্রণ মানে ভাল খাবারের বন্দোবস্ত থাকাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি সমাজে প্রচলিত নিমন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা করেছেন। কেননা প্রচলিত নিমন্ত্রণ ব্যবস্থায় বাঙালীর মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা নেই। তাই নতুন নিমন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;—

"নিমন্ত্রণের অন্যান্য নানা উপকরণের মধ্যে আহার বলিয়া একটা পদার্থ রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত নিমন্ত্রণটা যেন আহার না হয়। পরস্পরে মিলিয়া গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, কথোপকথনের চর্চা আরও বহুলতররূপে আমাদের সমাজে প্রচলিত হউক।"(১১৪)

'নিমন্ত্রণ সভা'র দ্বারা প্রাবন্ধিক সমাজে প্রচলিত নিমন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তে সুস্থ মানসিক বিনোদন ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য আহ্বান জানান।

'সমাজে স্ত্রী পুরুষের প্রেমের প্রভাব' (পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক, ২৪/১১/১৮৮৮) প্রবন্ধে সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণের নিন্দা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—নারী পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ। তাঁর ভাষায়;—

> "আমাদের দেশে পরিবার আছে, কিন্তু সমাজ নাই তাহার এক প্রধান কারণ স্ত্রীলোকেরা পরিবারের মধ্যে বদ্ধ, সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত নহে। স্ত্রীলোকের প্রভাব কেবলমাত্র পরিবারের পরিধির মধ্যেই পর্যাপ্ত। পরিবারের বাহিরে আর মানব সমাজ নাই, কেবল পুরুষ সমাজ আছে। ...আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র গৃহিণী, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাদের সহিত কেবল আমাদের সুবিধার যোগ,"(১১৫)

রবীন্দ্রনাথ সমাজের নারীর প্রতি অবিচারের বিরোধিতা করেন। তিনি বলতে চেয়েছেন নারীকে এভাবে দাসীতে পরিণত করায় সমাজের অবনতি হচ্ছে। সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য নারী পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন। তাঁর ভাষায়;—"স্ত্রী-পুরুষগত প্রেমের ন্যায় প্রবল শক্তি আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। এই শক্তি ষোল আনা মাত্রায় সমাজের কাজে লাগাইলে মানবসভ্যতা অনেকটা বল পায়।"(১১৬) এই বক্তব্যের মধ্যে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীয় সমাজের উন্নয়নের ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষা মানুষের জীবনে একটি অতি প্রয়েজনীয় উপাদান। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেনে। তিনি উনিশ শতকে রচিত প্রবন্ধেও এবিষয়ে আলোকপাত করেন। রবীন্দ্রনাথ "ছাত্রদের নীতিশিক্ষা" (সাধনা, মাঘ, ১২৯৯) প্রবন্ধে নীতিশিক্ষা দেবার নতুন নীতির কথা বলেন। তাঁর ভাষায়;—

> "নিঃসন্দেহ নীতিশিক্ষা দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সর্বতোভাবেই প্রশংসনীয়। শুধু আমার বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাঁধিবোল দ্বারা এ কার্য সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহাকে ইংরাজিতে 'কপি-বুক মোরালিটি বলে, তাহার দ্বারা এ পর্যন্ত কাহারও চরিত্র সংশোধন হইতে দেখা যায় নাই।"(১১৭)

শুষ্ক নীতিশিক্ষার দ্বারা ছাত্রকে সুনাগরিক গড়া সম্ভব নয়। লেখকের মতে;—

> "নীতি বচনের বাঁধিবোলের মধ্যে পবিত্রতা ও ন্যায়ের সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কতদূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ তো বরং ভালো নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও।"(১১৮)

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিকে ধরিয়ে দিয়েছেন। যে ত্রুটি সংশোধন করলে এদেশে মানব সম্পদ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

'ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক' (সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০২) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অমানবিক দিক উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক পাঠদান শিক্ষার্থী নিপীড়নের নামান্তর। যা চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারে না। লেখক বলেন;— "ভোজনের মাত্রা পরিপাকশক্তির সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহাতে লাভ নাই বরঞ্চ ক্ষতি, ...মানসিক ভোজন সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে"[১১৯] রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার বিকাশের জন্য পরামর্শ দেন;— "অন্তত এন্ট্রেন্স ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় অধীত হয় তবে শিশুপীড়ন অনেকটা দূর হইতে পারে। ...আমরা ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক শক্তির এই অন্যায় অপব্যয় নিবারণের উদ্দেশ্যেই এন্ট্রেন্স স্কুলে বাংলা ভাষায় বিষয় শিক্ষা দিতে অনুরোধ করি।"[১২০] এই প্রবন্ধে লেখক স্বদেশীয় শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুচিন্তিত মতামত দেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাঙালীর আত্মউন্মোচনের যে উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল, এই শতকের শেষদিকে তার স্বীকৃতি মেলে। এই প্রসঙ্গে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর আলোচনা করব। কেননা, অধ্যাত্মিকক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের নিকট ভারতের গৌরবকে বিবেকানন্দ স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন এবং জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কারের দ্বারা স্বদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের স্বদেশ ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এক উল্লেখযোগ্য নাম। বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী। প্রশ্ন জাগতে পারে, বাংলা সাহিত্যের স্বদেশ ভাবনায় একজন সন্ন্যাসীর কি অবদান থাকতে পারে? প্রথমেই মনে হবে, বিবেকানন্দ স্বদেশের সভ্যতা সংস্কৃতির গৌরব দেশ-বিদেশে সাফল্যের সঙ্গে প্রচার করেন। বিবেকানন্দই বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে (১৮৯৩) হিন্দু ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনের প্রথম ভাষণে তিনি হিন্দু ধর্মের উদার মনোভাবের কথা প্রকাশ করে বলেন;—

> "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true."[১২১]

এছাড়া বিবেকানন্দ বাংলায় অনেকগুলি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। যে লেখাগুলিতে তাঁর মনের দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বাংলা রচনাগুলির দেশানুরাগকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা; স্বদেশবাসীর জীবন সমৃদ্ধ করার নীতি-উপদেশ ও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয় উপদেশ।

বিবেকানন্দ বিলাসী সাহিত্য পছন্দ করতেন না। শিকাগো থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি পত্রে বিবেকানন্দ লিখেছেন;—"দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; ...গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না, আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোনো উপকার নেই।"(১২২) বিবেকানন্দ বিলাসী কাব্য সাহিত্যের থেকে মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাকে বেশী মূল্য দিতেন। সেই জন্য সাহিত্য চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন না—এমন নয়। যদি সাহিত্যের দ্বারা কোনো রকম উপকার করা সম্ভব হয়, তিনি তা থেকে পিছপা হন নি। বলা যায়—বিবেকানন্দের সমস্ত রকম রচনার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ জাতীয় রচনা হল— 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত'। এখানে 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করা হচ্ছে।

'ভাববার কথা' স্বামী বিবেকানন্দের একটি অন্যতম রচনা। গ্রন্থটিতে লোকশিক্ষার একাধিক অবতারণা আছে। বাংলা ভাষার বিষয়ে বিবেকানন্দের মূল্যবান উপদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গটি অন্যত্র আলোচিত হওয়ায় এখানে অন্যান্য নীতি-উপদেশের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বিবেকানন্দ স্বজাতির মুক্তির জন্য কতগুলি প্রয়োজনীয় গুণাবলী কামনা করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

> "চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই-সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"(১২৩)

সমকালীন জাতীয় জীবনে দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য উক্ত বিষয়গুলি একান্ত প্রয়োজন ছিল। বিবেকানন্দ ইহলোকের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন;—"নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"(১২৪) বিবেকানন্দ ইহলোকের সমকালীন চরম দুর্দশা দূরীকরণের জন্য রজোগুণের অধিকারী হওয়ার আহ্বান জানান। লেখকের এজাতীয় নীতি-উপদেশ স্বদেশ ভাবনারই নামান্তর।

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক একটি ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বিবেকানন্দ বলেন;—"পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।"(১২৫) তিনি বলেন— নতুন যুগে শূদ্রশক্তির বিকাশ ঘটবে। বিবেকানন্দের ভাষায়;—"কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত

হইতেছে।"[১২৬] যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে চার বর্ণের উত্থানপতনে লেখক দুঃখিত নন। বরং তিনি চেয়েছেন— যুগযুগ ধরে নিপীড়িত শূদ্রের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক্। প্রসঙ্গত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি পত্রের কথা মনে হয়। বিবেকানন্দ লিখেছিলেন;— " 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজী বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।"[১২৭] চিঠির এই বক্তব্য চির নিপীড়িত, অত্যাচারিত শূদ্রের প্রতি বিবেকানন্দের সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা লক্ষ করব, 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দ স্বদেশের মানব সম্পদ বৃদ্ধির পরিকল্পনায় মগ্ন। এই পরিকল্পনা স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ ভাবনার পরিচয় বহন করে। তাঁর স্বদেশ ভাবনার অকৃত্রিম প্রকাশ 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধের শেষে পাওয়া যায়। ভাষা ও ভাবের উপযুক্ত মেলবন্ধন স্বদেশপ্রেমের আবেদনকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। তাঁর ভাষায়;—

> " হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ;"[১২৮]

এই বক্তব্য শুধু নীতি-উপদেশই নয়, যেন 'স্বদেশমন্ত্র'। এখানে খুব সংক্ষেপে দেশের মূল সমস্যার উত্থাপন ও তা সমাধোনের পথনির্দেশ আছে। সমকালে ভারতে মূল সমস্যা পরানুকরণ, দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করার জন্য উপদেশ; দরিদ্র, মূর্খ, চন্ডাল, মুচি, স্বদেশবাসীকে মানবিক মর্যাদা প্রদানের উপদেশ; নারীকে সীতা, সাবিত্রী প্রমুখের আদর্শ গ্রহণ করার উপদেশ; সর্বোপরি স্বদেশের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ মনে করার আহ্বান — 'বর্তমান ভারত'কে অকৃত্রিম দেশানুরাগ মূলক গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছে।

বাংলা ভাষা বিষয়ে বিবেকানন্দ গ্রহণযোগ্য মতামত দিয়েছেন; যা তাঁকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগীদের নিকট অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। 'ভাববার কথা' প্রবন্ধের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক আলোচনায় বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। বলা যায়, এই ভাবনাগুলি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন;—"ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—লক্ষণ।"[১২৯] বিবেকানন্দ বাঙালীর উন্নয়ন করতে বাংলা ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করেন। বাংলা ভাষা কি করে বাঙালীর উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে সে বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। তিনি প্রথমেই বলেন;—

> "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিতমাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?"[১৩০]

এখানে বিবেকানন্দ চলিত ভাষার গুরুত্বকে স্বীকার করেন। তাঁর মতে, চলিত ভাষা সকলের বুঝবার পক্ষে উপযোগী। অথচ লেখকেরা চলিত ভাষা ছেড়ে কৃত্রিম একটি ভাষায় লেখেন। তিনি বাঙালী লেখককেও চলিত ভাষা ব্যবহারের জন্য আবেদন করেন। স্থান বিশেষে বৈচিত্র্যময় বাংলা ভাষার সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বিবেকানন্দ বলেন;—"প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।"[১৩১] এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষাপ্রীতির মনোভাবকে বিসর্জন দিতে হবে। বিবেকানন্দ এ বিষয়ে লিখেছেন;—"সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।"[১৩২] বাংলা ভাষার উন্নয়নে বিবেকানন্দের এ জাতীয় নীতি-উপদেশ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালীর বিজ্ঞান চর্চায় এক স্মরণীয় নাম। বিজ্ঞান চেতনায় শ্রেষ্ঠ দেশ ইউরোপ ও আমেরিকায় তিনি তাঁর বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। দেশে-বিদেশে জ্ঞানী-গুণী মহলে জগদীশচন্দ্র বসু সম্মানিত হয়েছেন। বাঙালী বিজ্ঞান চর্চায় দেশ-বিদেশে সাফল্য ও স্বীকৃতি পাবে—এই বিষয়টি সচেতন বাঙালীর নিকট গৌরবের বিষয়। আর তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগদীশচন্দ্র বসুকে বলেন;—

"বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধু তীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।"[১৩৩]

—এখানে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় গৌরব বোধ করেছেন।

আমরা লক্ষ করব, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু দেশ-বিদেশের অনেক সম্মান লাভ করার পরেও নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভুলে যান নি। বিজ্ঞান বিষয়ে পাশ্চাত্যের নিকট সম্মান লাভের পর তিনি মেকি সাহেব হতে পারেন নি। জগদীশচন্দ্র বসুর স্বদেশ, মাতৃভাষা, স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগের ফসল 'অব্যক্ত' (১৩২৮) গ্রন্থটি। যদিও গ্রন্থটি বিশ শতকে প্রকাশিত, তবুও উনিশ শতকের অনেক প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। যথা;—'যুক্তকর' (১৮৯৪), 'আকাশ স্পন্দন ও আকাশ সম্ভব জগৎ' (১৮৯৫), 'গাছের কথা' (১৮৯৪), 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু', 'মন্ত্রের সাধন', 'অগ্নি পরীক্ষা' (১৮৯৫), 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' (১৮৯৪) নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছে। স্থূল দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, জগদীশচন্দ্র বসু এতবড় একজন বিজ্ঞানী হয়েও কেন দরিদ্র মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন? জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকার বক্তব্যেই এর উত্তর আছে। তিনি লিখেছেন;—

> "ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব কখনও আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সেই ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল।"[১৩৪]

এখানে প্রাবন্ধিক জগদীশচন্দ্র বসু মাতৃভাষার গৌরব গান গেয়েছেন। তিনি মাতৃভাষাকে হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত বলে মনে করেন। কোনো ভাষাবিজ্ঞানী যা অস্বীকার করতে পারেন না। এবং তিনি আরো বলেন যে, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে 'অব্যক্ত'-এর অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ মাতৃভাষায় লেখা হয়েছে। এই বক্তব্যে আমরা জগদীশচন্দ্র বসুর মাতৃভাষা প্রীতির পরিচয় পাব। তিনি যেন এখানে পরোক্ষে

কয়েকটি উপদেশ দিতে চেয়েছেন। যথা;— বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ রচনা করা যায়। এখন থেকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গবেষণার চেষ্টা করলে বাঙালীর উপকারই হবে। কেননা, মাতৃভাষায় অনুভূতি বা ভাব প্রকাশ করা খুবই সহজ।

বাঙালী বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মাতৃভাষা প্রীতির আরো পরিচয় পাওয়া যায় 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'কথারম্ভ' নামক অংশে। মৌলিক গবেষণা করতে গিয়ে তিনি নানা অবিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন;—"বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে; সেখানে বাদ প্রতিবাদ কেবল ইউরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এদেশেও প্রিভি-কাউন্সেলের রায় না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার প্রতিকারের জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফল হয় ত এই জীবনে দেখিব না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের ভবিষ্যৎ বিধাতার হস্তে!"[১৩৫]

এখানে পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব বলা যায় জগদীশচন্দ্র বসুর মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর আন্তরিকতা ছিল। এই অকৃত্রিম আন্তরিকতার ফসল আলোচ্য 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি।

দীর্ঘদিনের জরাগ্রস্ত বাঙালী জীবনকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত নীতি-আদর্শ। প্রবন্ধ ও প্রবন্ধজাতীয় রচনায় যুক্তির দ্বারা আপামর বাঙালীকে পথাদর্শের অবতারণা আছে। আমরা এই অধ্যায়ে ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতন, সমৃদ্ধ ও পারদর্শী হবার প্রকৃত মত ও পথের পরিচয় পেয়েছি। উনিশ শতকে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধ ও প্রবন্ধজাতীয় রচনায় এই পথাদর্শ বাঙালীকে সচেতন করার প্রেরণা বা উৎসাহ দানের ভাবনায় সমৃদ্ধ। বলা বাহুল্য — প্রাবন্ধিকের এই প্রেরণা বা উৎসাহ দানের প্রচেষ্টা উনিশ শতকের স্বদেশ ভাবনার নামান্তর।

উল্লেখপঞ্জী

১। উৎকল বর্ণন, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৮৭।

২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

৩। কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১০০।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০২।

৫। শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৩৪।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৩।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৪।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৬।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪।

১৩। বঙ্গবিদ্যার আদ্য বিবরণ, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৬৩।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১।

১৬। বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৭১।

১৭। বিজ্ঞাপন, বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৬৯।

১৮। বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৮৬।

১৯। কলিকাতা কল্পলতা, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক — ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১।

২০। পারিবারিক প্রবন্ধ, ভূদেব রচনাসম্ভার — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ: ৪৫৩।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫৫।

২২। সামাজিক প্রবন্ধ, ভূদেব রচনাসম্ভার — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ: ২৪৬।

২৩। আচার প্রবন্ধ, ভূদেব রচনাসম্ভার — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ: ৫০২।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০৩।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০৩।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০৫।

২৭। ধর্ম্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ,১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৬১।

২৮। বিজ্ঞাপন, লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ষোল।

২৯। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১-৪।

৩০। ইংরাজ স্তোত্র, লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৯।

৩১। New Year's Day, লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১১।

৩২। কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৪৫।

৩৩। একা 'কে গায় ওই ?', কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৪৬।

৩৪। বিড়াল, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৭৭।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৭।

৩৬। স্ত্রীলোকের রূপ, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৬৫।

৩৭। আমার মন, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৪।

৩৮। আমার দুর্গোৎসব, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৭২।

৩৯। বাঙ্গালীর মুনষ্যত্ব, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্ত, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৮৫।

৪০। কমলাকান্তের জোবানবন্দী, কমলাকান্ত, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৯৫।

৪১। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৯৫৩।

৪২। বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞানরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: উনিশ।

৪৩। লোকশিক্ষা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩২৪।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৫।

৪৫। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৩৭।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩৭।

৪৭। বাঙ্গালা ভাষা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩২১।

৪৮। অনুকরণ, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১৭৭।

৪৯। প্রাচীনা ও নবীনা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২২১।

৫০। রামধনপোদ, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩২৬।

৫১। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২১৪।

৫২। গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৩২।

৫৩। বিজ্ঞাপন, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৯৫৯।

৫৪। বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৮৭।

৫৫। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৯০।

৫৬। সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩৩৯।

৫৭। প্রাগুক্ত, ৩৩৯।

৫৮। প্রাগুক্ত, ৩৪৫।

৫৯। উপক্রমণিকা, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩৫৩।

৬০। প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৯৬০।

৬১। ভূমিকা, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৯৬২।

৬২। ধর্ম্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫২৬।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩০।

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯৮।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০৭।

৬৬। রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ: ১৩১।

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩২।

৬৮। আত্মচরিত, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ৫৯।

৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯।

৭০। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্‌স ষ্টোর, পৃ: ৪৪৮।

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫০।

৭২। সে কাল আর এ কাল, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্‌স ষ্টোর, পৃ: ২৮৭।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৭।

৭৪। প্রথম বারের বিজ্ঞাপন, সে কাল আর এ কাল, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্‌স ষ্টোর, পৃ: ২৮৬।

৭৫। সে কাল আর এ কাল, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্‌স ষ্টোর, পৃ: ৩০৫।

৭৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৪-৩৩৫।

৭৭। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্‌স ষ্টোর, পৃ: ২৫২।

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫২।

৭৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৩।

৮০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৩।

৮১। প্রকাশকের নিবেদন, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: [৬]

৮২। সাহিত্যের উদ্দেশ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৪৮-২৪৯।

৮৩। সভ্যতা ও সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৫১।

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫১।

৮৫। সাহিত্যের গৌরব, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৭৮।

৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭৮।

৮৭। বাঙালী কবি নয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২২৬।

৮৮। বাঙালী কবি নয় কেন, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৪১।

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪১।

৯০। আলস্য ও সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৫২।

৯১। সংগীত ও ভাব, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৮৬।

৯২। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৬।

৯৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৬।

৯৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৬।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৯।

৯৬। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৫০০

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০০।

৯৮। ডুবদেওয়া, আলোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ২১।

৯৯। ধর্ম, আলোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ৩০।

১০০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

১০১। আত্মা, আলোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ৪৪।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।

১০৩। অনাবশ্যক, সমালোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ৫৮-৫৯।

১০৪। মেঘনাদবধ কাব্য, সমালোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ৭০।

১০৫। বাউলের গান, সমালোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ১০৫।

১০৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

১০৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১০৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১১০। পারিবারিক দাসত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৭০।

১১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭২।

১১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭৩।

১১৩। নিমন্ত্রণ সভা, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৮৪।

১১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮৭।

১১৫। সমাজে স্ত্রী পুরুষের প্রেমের প্রভাব, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৪৬৩।

১১৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬২।

১১৭। ছাত্রদের নীতিশিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৪২।

১১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৪।

১১৯। ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৪৪।

১২০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৫-৩৪৯।

১২১। Chicago addresses response to welcome at the world's parliament of religions' Chicago, 11th September 1893, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ১০।

১২২। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ৮৫৬।

১২৩। ভাববার কথা, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ৫০।

১২৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০।

১২৫। বর্তমান ভারত, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ১০১।

১২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

১২৭। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ৮৫৬।

১২৮। বর্তমান ভারত, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ১০৭।

১২৯। বাঙ্গালা ভাষা, ভাববার কথা, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ৫১।

১৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।

১৩১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।

১৩২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।

১৩৩। জগদীশচন্দ্র বসু, কল্পনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৩২।

১৩৪। কথারম্ভ, অব্যক্ত, বাউলমন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ ১৩২৮, ৫ম মুদ্রণ ১৪০০, পৃ: ৩।

১৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।